৯

এই পাঠগুলোর যৌক্তিক যোগসূত্রটি স্বত:প্রতীয়মান। গ্রন্থের শেষ ইউনিট হিসাবে এই গ্রন্থে এ যাবৎ আলোচিত সকল পাঠের একটি দার্শনিক সমন্বয় হিসাবেও এই পাঠগুলোকে পরস্পর যুক্ত একটি সমগ্র হিসাবে পড়তে হবে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছেঃ

- **পাঠ-১. মানব উন্নয়ন ঃ তত্ত্ব ও তুলনামূলক পরিমাপের সমস্যা**
- **পাঠ-২. মানব উন্নয়ন ঃ সাম্প্রতিক প্রবনতাসমূহ, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান**
- **পাঠ-৩. মানব উন্নয়নের পথের সন্ধ্যানে ঃ প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পুর্বশর্তের অনুপস্থিত**

পাঠ-৯.১ ঃ দারিদ্র্য : সংজ্ঞা ও পরিমাপ

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- মানব উন্নয়নের বিভিন্ন তত্ত্ব;
- মানব উন্নয়নের তুলনামূলক পরিমাপ সংক্রান্ত আলোচনা।

মানব উন্নয়ন নিয়ে আলোচনার পূর্বে "উন্নয়ন" বিষয়ে একটি সাধারন ধারনা নির্মাণ প্রয়োজন। জগতে সকল সত্তাই যেহেতু পরিবর্তনশীল সেহেতু পরিবর্তনের প্রকৃতি নিয়ে মানুষের চিন্তার শেষ নেই। পরিবর্তন কি ভালোর দিকে না মন্দের দিকে, উন্নতির দিকে না কি অধোগতির দিকে হচ্ছে এটি নির্ণয়ের একটি মাপকাঠির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বস্তুত: এই মাপকাঠি নির্নয়ের মাধ্যমে মানুষ দুটি সমস্যার সমাধান করে থাকে। প্রথম: পরিবর্তনের প্রকৃতি বা গুণ নির্ণয় (অর্থাৎ এটা আদৌ উন্নতি না অনুন্নতি তা নির্ধারন)। দ্বিতীয় পরিবর্তনের ফলে উন্নয়নের মাত্রা বা পরিমান কতটুকু হলো তা নির্ধারন। দ্বিতীয়টিও জরুরী। কারণ একাধিক উন্নয়নের মাত্রা বা পরিমান কতটুকু হলো বাস্তবে অগ্রসর হওয়া কঠিন। কিন্তু মানব সমাজে এখন পর্যন্ত উন্নয়নের গুণবাচক বা পরিমানবাচক মানদন্ডটি নিয়ে কোনো ঐক্যমতের সৃষ্টি হয় নি। তাই উন্নয়নের সংজ্ঞা স্থান কাল-পাত্র ভেদে একেক জনের কাছে একেক রকম রয়ে গেছে।

সর্বদা সামাজিক সংখ্যাগরিষ্টের দ্বারা কাম্য পরিবর্তনকেই নিঃসন্দেহে তাদের উন্নতিমূলক হিসাবে অভিহিত করা চলে না। কোনো পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলার জন্য ঐ পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশের চাওয়াটা একটি অনিবার্য পূর্বশর্ত হতে পারে কিন্তু যথেষ্ট পূর্বশর্ত নয়।

উন্নয়নকে তাই একটি নৈতিক প্রত্যয় (Normative concept) হিসাবে মেনে নিয়ে অনেকেই এর যে বিষয়ীগত সংজ্ঞা (Subjective Definion) দিয়েছেন তা হচ্ছে "কাম্য পরিবর্তনই উন্নয়ন'। এই অর্থে 'মানব উন্নয়ন হচ্ছে মানব নির্ধারিত মানবের কাম্য পরিবর্তন'। এই একান্ত বিষয়ীগত সংজ্ঞার বিপদ আছে। ধরা যাক একজন মাতাল আরো মদ খেতে চাচ্ছেন। এই মদ খাওয়াটা ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে কাম্য হলেও তা তার জন্য উন্নয়নমূলক পরিবর্তন যে ঘাটাবে না এ ব্যাপারে আমরা অন্য সবাই বা বেশিরভাগ মানুষ নিশ্চয়ই একমত হব। এই সামাজিক বিষয়ীগত গণতান্ত্রিক সংজ্ঞার অনেক বিপদ আছে। ধরা যাক হিটলারের জার্মানিতে বেশিরভাগ মানুষ নিছক পৃথক ধর্মমতের জন্য ইহুদি নিধনের একটি যজ্ঞ কামনা করেছেন, কিন্তু সেটা তাদের অধিকাংশের দ্বারা কাম্য হলেও তা তাদের মানবিক উন্নতি যে ঘটাবে না সে বিষয়ে সম্ভবত অন্য কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না। এ থেকে বোঝা যায় সর্বদা সামাজিক সংখ্যাগরিষ্টের দ্বারা কাম্য পরিবর্তনকেই নিঃসন্দেহে তাদের উন্নতিমূলক হিসাবে অভিহিত করা চলে না। কোনো পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলার জন্য ঐ পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশের চাওয়াটা একটি অনিবার্য পূর্বশর্ত হতে পারেন, সে জন্য অধিকাংশের কামনার সুনির্দিষ্ট আধেয়গুলোকে আমাদের বিশ্লেষনের আওতায় আনতে হবে। উপরন্তু ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে পরিবর্তনের ঢেউ যেহেতু সারা মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্য মানুষ ও প্রকৃতির উপর তার নানা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুদুরপ্রসারী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকে সুতরাং পরিবর্তনের কাম্যতার বিচারক গোষ্ঠীটি কোনো স্থির সংকীর্ন একক একটি গোষ্ঠী হতে পারে না। তাই জার্মানির পরিবর্তন সম্পর্কে জার্মানির তদানিন্তন বাসিন্দারাই চুড়ান্ত রায় দানের অধিকারী নন। আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে পরিবর্তনকে তারা তখন উন্নয়ন হিসাবে কামনা করেছিলেন, তার সঙ্গে তদানিন্তন বিশ্বমানব সমাজের প্রয়োজনকে তারা তখন উন্নয়ন হিসাবে কামনা করেছিলেন, তার সঙ্গে তদানিন্তন বিশ্বমানব সমাজের প্রয়োজনের সামঞ্চস্যতা আদৌ ছিল কি না, বিশ্বমানবের জন্য তখন তা কাম্য ছিল কি না? সুনির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ আপেক্ষিক মানদন্ডে কোন কামনার পাশা করাটাই যথেষ্ট নয়, তাকে পুনরায় দ্বিতীয়বার পরীক্ষার জন্য মহাকাল মহাবিশ্ব ও বিশ্বমানবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আর যেহেতু মহাকাল-মহাবিশ্ব ও মহামানবের অগ্রযাত্রা অনন্তকাল ধরে চলছে সেহেতু "উন্নয়নের" যে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার যাচাই ও পুনঃযাচাই অন্ততকাল ধরেই চলতে

থাকবে। এ ধরেনের একটি চলতি প্রবাহমান সংজ্ঞাই সম্বত উন্নয়নের সঠিক সংজ্ঞা। এরপরেও নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে উন্নয়নের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্মাণ সর্বদাই সম্ভব এবং তা কিছুটা অপরিহার্যও বটে। কিন্তু তা যে নিয়ত পরিবর্তনশীল সেটি মনে রেখে গোড়ামিশূন্য ভাবে বাস্তবে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারাটাই হচ্ছে উন্নয়নের পথে নির্ভূলভাবে এগোনোর অন্যতম শর্ত।

পরিবর্তনশীল মানুষের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয় কাম্যতাই হচ্ছে উন্নয়নের আধেয় তাহলে স্বভাবতই উন্নয়নকে বোঝার জন্যে আমাদের জানতে হবে সাধারণভাবে মানুষের কি কামনা করে থাকে এবং কিভাবে তাদের এই কামনা বদলায়?

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যদি একমত হই যে, পরিবর্তনশীল মানুষের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয় কাম্যতাই হচ্ছে উন্নয়নের আধেয় তাহলে স্বভাবতই উন্নয়নকে বোঝার জন্যে আমাদের জানতে হবে সাধারণভাবে মানুষের কি কামনা করে থাকে এবং কিভাবে তাদের এই কামনা বদলায়? এর কোন স্থির নিয়ম আছে কিনা, না কি একান্তভাবেই তা ব্যক্তি ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে এ প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানে সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছেন এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এমন কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে বলা হলে আমি প্রথমেই যার নাম বলবো তিনি হচ্ছে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। অবশ্য বর্তমান যুগ বলতে কেউ উনবিংশ শতাব্দিকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেন তাহলে এই উত্তরটা বদলে গিয়ে হবে মহান জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস। যদিও মার্কসের ভ্রান্ত পাঠ থেকে মনে হতে পারে তিনি বিশেষ শ্রেণীর উন্নয়নের অনুসারী মানব দায়ী করা যায় না। কেন একটি জিনিস একটি ব্যক্তি মানুষের কাছে কাম্য বলে প্রতিভাত হয় এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মার্কসের বিপরীতে উনবিংশ শতাব্দির উপযোগবাদীরা (Utilitarians) নানাভাবে শুধু একটি বিষয়ের দিকেই আঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন এবং তা হচ্ছে: ব্যক্তির ব্যক্তিগত তৃপ্তি, সুখ, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা পূরণ ইত্যাদি। নিজে মার্কসবাদী না হয়েও সেন এই ধারনাটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন দুই কারণে। প্রথমত: মানুষ নিছক 'অর্থনৈতিক মানুষ' (Home-Economics) নয়। সুতরাং তার ইচ্ছা বা কামনা শুধু ব্যক্তিগত তৃপ্তি বা সুখের সর্বোচ্চকরণে সীমাবদ্ধ থাকে না। একজন মানবহিতৈষী ব্যক্তি অন্যের জন্য যখন স্বেচ্ছায় কষ্টবরণ করে আনন্দ পান তখন মানুষ হিসাবে তার কোনো উন্নতি কি হল না? একজন দেশপ্রেমিক দেশের জন্য যখন জীবন দান করেন তখন তার এই কাম্য পরিবর্তনকে কি আমরা তার জন্য দুঃখজনক একটি অনুন্নতি হিসাবে অভিহিত করবো? তৃপ্তিবাদীরা অবশ্য এই প্রশ্নগুলোর সহজ উত্তর দিবেন, 'না, ঐগুলোও উন্নতি, কারণ ঐ ব্যক্তির কাছে ঐটিই তৃপ্তি। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞার অসঙগতি বা বিপত্তি তারা খুজে পাবেন না। কিন্তু ঐ ভাবে ব্যক্তিগত তৃপ্তির আধেয়কে নিছক আকাঙ্খা পূরনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে আনলেও পুরোটা সমস্যা যে কেটে যায় না সেটাও সেন একটি চমৎকার যুক্তি ও উদাহরনের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। আমরা অবশ্য মাতালের মদের আকাঙ্খা পূরনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে আনলেও পুরোটা সমস্যা যে কেটে যায় না সেটাও সেন একটি চমৎকার যুক্তি ও উদাহরনের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। আমরা অবশ্য মাতালের মদের আকাঙ্খা পূরণ বা হিটলাটের আগ্রাসী আকাঙ্খা পূরনের উদাহরণ দ্বারাই আগেই দেখিয়েছি যে যা কিছু মানুষ চায় তাই তার জন্য মূল্যবান বা উন্নতি নয়। একটা বিষয়ক উন্নত বা মূল্যবান হিসাবে নির্ধারণের ক্ষেত্রে "আকাঙ্ক্ষা " একটি অপরিহার্য উপাদান হতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট উপাদান নয়। আকাঙ্ক্ষা যে কত বিচিত্র হতে পারে এবং তার সঙ্গে উন্নতিকে গুলিয়ে ফেললে তাতে যে কত বিভিন্ন বিভ্রাটের সৃষ্টি হয় তার আরো দুটি চমৎকার প্রাসঙ্গিক উদাহরন দিয়েছেন সেন। তিনি লিখেছেন:

একটা বিষয়ক উন্নত বা মূল্যবান হিসাবে নির্ধারণের ক্ষেত্রে "আকাঙ্ক্ষা " একটি অপরিহার্য উপাদান হতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট উপাদান নয়।

শোষিত ক্রীতদাস, ভেঙ্গে পড়া বেকার আশাহীন নিঃস্ব মানুষ, বশ্যতা মেনে নেওয়া গৃহবধুর ছোট খাটো কিছু আহাদের সাহস হয়তো আছে, কিন্তু এই সব শৃঙ্খলিত আকাঙ্ক্ষার পূরন কোনো বড় সাফল্যকে চিহ্নিত করে না। অবস্থাপন্নের আত্মবিশ্বাসে ভরা অভিলাষের সঙ্গে সেটাকে একভাবে দেখা যায় না, কেননা অভিলাষ প্রায়শ: দাবির আকার নেয়। তাই আকাঙ্ক্ষা পূরণ মূল্যের যদিবা বিষয় হতে পারে, একমাত্র বিষয় হতে পারে না। মূল্যায়নের উপায় হিসাবে তা আরো জোরদার

সেন অস্বীকার করেছেন আকাক্ষাকে মূল্যায়নের একমাত্র ভিত্তি হিসাবে গ্রহন করার সময় বিষয়ীগত অবস্থানকে।

দাবি রাখতে পারে, কিন্তু সে দাবীও খুব শক্তিশালী নয়। আকাঙ্ক্ষা করা আর মূল্য দেয়া এক জিনিস নয়, তেমনি মূল্যের উৎসও নয়, কোনটাকে মূল্য দেয়া হয় বা কোনটাকে মূল্য দেয়া উচিত তার কোনো ইঙ্গিত সেখানে থেকে ভালভাবে পাওয়া যায় না। অতএব মূল্যায়নের ভূমিকায় আকাঙ্ক্ষা বড়ই অবস্থা নির্ভর (এ.কে.সেন জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি ১৯৯০, পৃ-৫৮)। সেন মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করেননি। অস্বীকার করেছেন তাকে মূল্যায়নের একমাত্র ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার চরম বিষয়ীগত অবস্থানকে। আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে তার মধ্যে কিভাবে রক্ত মাংসের সার্বজনীন প্রয়োজনীয় মানবিক বিষয়গুলোকেও যুক্ত করা যায় সেটিই সেনের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সেন মানুষের দুটি পৃথক কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল প্রবনতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। তার মতে আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রধানত: দুটি দিকে ধাবিত হয়:

১. প্রত্যেক মানুষই একটি অবস্থা থেকে অন্য উন্নতির অবস্থায় পৌঁছাতে চায়। এই চাওয়াটা কার্যকরী হয় মানুষের "হয়ে ওঠার" মাধ্যমে। বর্তমান অবস্থার যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে নতুন অবস্থায় পৌঁছানোর এই প্রবনতাকে সেন ব্যাপকার্থে "মানুষের হয়ে ওঠার" প্রক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করেছেন।
২. আবার মানুষ শুধু উন্নত অবস্থায় চায় না, মানুষ কিছু সক্রিয় কর্মের মাধ্যমে আপন সৃষ্টিশীলতাও চরিতার্থ করতে চায়। এ ক্ষেত্রেও অবস্থান্তর হবে কিন্তু নিছক অবস্থান্তর এখানে আন্তর্জাতিকভাবে মূল্যবান (Intrisically Valuable) নয়, নতুন অবস্থান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির সক্রিয় সৃজনশীল ভূমিকাই এখানে প্রকৃত মূল্যবান বিষয়।

বস্তুগত প্রাচুর্য সৃষ্টিকে উন্নয়ন হিসাবে প্রতিহত করে সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্ব কার্যত: মানুষের ভোগী সত্ত্বাকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এর বিপরীতে সেন মানুষকে উন্নয়নের রূপমঞ্চে প্রধান কর্তার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করে খোদ মানুষের অধিকার ও ক্ষমতাকে প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরে সেন সহজেই পৌঁছে যান মানব উন্নয়নের ইস্পিত সংজ্ঞায়। অর্থাৎ তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মানুষের 'হওয়ার' এবং 'করার' পরিধি যত প্রসারিত হবে, অর্থাৎ সেনের ভাষায় "করণ ভবন" (Funcationing) যত প্রসারিত হবে মানুষের উন্নতি ততই প্রসারিত হয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। সুতরাং চূড়ান্ত বিচারে বলা যায় 'হওয়া' ও 'করার' স্বাধীনতা যে সমাজে বা যে ব্যক্তির কাছে যত বেশি সে সমাজ বা সে ব্যক্তি তত বেশি উন্নত। কিন্তু সুবিদিত যে সেই সমাজের সদস্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে রয়েছে অসংখ্য পার্থক্য। একজন অন্ধ লোককে মূল্যবান একটি সিনেমার টিকেট প্রদান করে যদি বলা হয় তোমরা সিনেমা দেখার স্বাধীনতা প্রসারিত হল তাহলে কি তা গ্রহনযোগ্য হবে। নিশ্চয়ই তা গ্রহনযোগ্য হবে না। সেন নিজেই তাই স্বাধীনতার কার্যকরী প্রসারনের জন্য ব্যক্তির আরো দুটি গুনের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। একটিকে তিনি নাম দিয়েছেন entitiement বা স্বত্ত্বাধিকার। আরেকটির নাম Capability বা সক্ষমতা। আমাদের উপরোক্ত উদাহরণে সিনেমা দেখার কার্যকর স্বাধীনতার শর্ত দুটি হচ্ছে যথাক্রমে সিনেমার টিকেটের উপর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ আইনসঙ্গত স্বত্ত্বাধীকার বা Legal entitiment এবং ব্যক্তির সিনেমা হলে যাওয়ার, সিনেমা দেখার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তার সক্ষমতা বা Capability বা অধিকার থাকলেই শুধু চলবে না, ব্যক্তির অধিকার প্রয়োগ ও ব্যবহারের সক্ষমতাও থাকা চাই। অধিকার ও সক্ষমতা এই দুইয়ের সোনায়-সোহাগায় মিলন যখন হবে তখনই প্রকৃত কার্যকরী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনই সমাজের সকল মানুষের "হওয়া" ও "করায়" পরিধি ক্রমশ: বাস্তবে বিস্তৃত হতে থাকবে এবং সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যকর হবে।

সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্বের সঙ্গে সেনের এই তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্ব "মানুষকে" উন্নয়নের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবে গণ্য করেনি। বস্তুগত প্রাচুর্য সৃষ্টিকে উন্নয়ন হিসাবে অভিহিত করে সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্ব কার্যত: মানুষের ভোগী সত্ত্বাকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এর বিপরীতে সেন মানুষকে উন্নয়নের রংগমঞ্চে প্রধান কর্তার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করে খোদ মানুষের অধিকার ও ক্ষমতাকে প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিনত করেছেন। সেন তাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন, বস্তুগত প্রাচুর্য সৃষ্টি, অর্থনীতিবিদরা যাকে বলে "মোট

প্রাচুর্যের বা আয়ের নিছক সুষম বন্টন ও উন্নয়ন নয়। হস্তান্তরযোগ্য পণ্য ও প্রাচুর্যের উপর অথ্যাধিক জোর দিতে গিয়ে সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্ব মানুষের আসল গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলোকে অবহেলা করেছে, এটিই সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্বের বিরুদ্ধে সেনের প্রধান অভিযোগ। সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্ব নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলেছে আর সেন নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমগ্র মানব উন্নয়নের অনেকগুলো উপায়ের মধ্যে একটি উপায় হিসাবে গণ্য করেছেন। তাই তার রচিত "অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন কোন পথে? শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এখন থেকে এক যুগেরও আগে লিখেছিলেন।

"সম্ভবত সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্বে প্রধান তত্ত্বগত ত্রুটি যে, এ তত্ত্বে জোর দেওয়া হয়েছে জাতীয় উৎপাদন, মোট আয় এবং বিশেষ বিশেষ পণ্যের মোট সরবরাহের উপর। মানুষের 'স্বত্বাধিকার এবং সেই স্বত্ত্বাধিকার থেকে পাওয়া ক্ষমতার দিকে নজর দেয়া হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টি। মানুষ কী করতে পারছে না, সেটাই উন্নয়নতত্ত্বের আলোচ্য হওয়ার কথা। মানুষ কি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে? উন্নয়নতত্ত্ববিদের কাছে এগুলোই হওয়া উচিত ছিল আসল প্রশ্ন। মার্কস যেমন বলেছিলেন, "মানুষের উপর অনিশ্চয়তা ও পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রনের বদলে অনিশ্চয়তা ও পরিস্থিতিকে নিয়ে আসতে হবে নিয়ন্ত্রনে।' (এ.কে.সেন প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৯৪)।

এই একই প্রবন্ধে সেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের উন্নয়নের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চীনের উন্নয়নের একটি তাৎপর্যপূর্ণ তুলনা হাজির করেছেন। সেখানে তিনি দেখান ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ এখনও অর্ধাহারে, অনাহারে, নীরব দুর্ভিক্ষে কালাতিপাত করেছে। তাদের অর্থনৈতিক অধিকার ন্যুনতম খাদ্যভান্ডার পর্যন্তই প্রসারিত হতে পারেনি ফলে তাদের শারীরিক পুষ্টিই যথেষ্ট নয়। অন্যান্য সক্ষমতা তো পরের ব্যাপার। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সেখানে যেহেতু ভোটেই ক্ষমতাবানদের জিততে হয় সেহেতু তারা এমন কোন খোলামেলা সংকট (যেমন সরব দুর্ভিক্ষ) সৃষ্টি হতে দিতে চান না, যার ফালে ভোটের প্রবাহ পরিবর্তিত হয়ে তারা ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন। এ কথা হয়তো সত্য যে ভারতে ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার প্রতিযোগীতাটুকু না থাকলে তাদের এটুকু সংবেদনশীলতাও থাকতো কিনা সন্দেহ। অপরদিকে চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোটি কোটি গ্রামীন পরিবারের অর্থনৈতিক স্বত্ত্বাধিকার এমন পরিমানে বিস্তার লাভ করেছে যে তাদের সারা বছর মোটেও নীরব দুর্ভিক্ষে কালাতিপাত করতে হয় না। তাদের আয়ু, পুষ্টি, শিক্ষা, সবকিছুই ভারতে তুলনায় বেশি। কিন্তু সেই চীনেই ১৯৫৯-৬১ কালপর্বে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় দেড়কোটি লোক মারা গেলেন। সেখানে শাসকদল সেই সময় সেনের ভাষায়, কতকগুলো ভ্রান্ত ও গোড়ামিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করায় এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ভারতের মতো সেখানে কোনো বিরোধী দল বা বিরোধী সংবাদপত্র ছিল না যা তদানীন্তন শাসক দলের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে সেই ভ্রান্ত নীতি শুধরে দিতে পারে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, জনগণের অর্থনীতিক সক্ষমতা চীনে প্রতিষ্ঠিত হলেও গণতান্ত্রিক সক্ষমতা সেখানে সামগ্রিক (Macro) পর্যায়ে গড়ে ওঠেনি। তাই কোনো ভূল নীতি বা এমনকি কোনো আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনেই অর্থনৈতিক সক্ষমতা, মাঠ পর্যায়ে তলা থেকে উদ্যোগ, তথ্য প্রবাহ, চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি যে প্রয়োজন হয় তা চীনে তখন কার্যকরী ছিল না বলেই মনে হয়। এই তুলনার ভিত্তিতে সেন একটি মূল্যবান প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তার ভাষায়:

দূর্ভিক্ষ এড়ানোর ব্যাপারো ভারত চীনের তুলনায় সফল হয়েছে অথচ স্থায়ী মজ্জাগত অপুষ্টি এবং অকাল মৃত্যুর সংকট মোচনে চীন যথেষ্ট সফল এবং ভারত সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিপরীত দুই রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যেকটিতেই কিছু সুবিধে আছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে অপূর্ব সম্মিলনের কথা সেনের মানব উন্নয়ন ধারনায় আদর্শ হিসাবে উঠে এসেছে

দুর্ভিক্ষ এড়ানোর ব্যাপারে ভারত চীনের তুলনায় সফল হয়েছে অথচ স্থায়ী মজ্জাগত অপুষ্টি এবং অকাল মৃত্যুর সংকট মোচনে চীন যথেষ্ট সফল এবং ভারত সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিপরীত দুই রাজনৈতিক

ব্যবস্থার প্রত্যেকটিতেই কিছু সুবিধে আছে। এমন কোনো ব্যবস্থা তৈরী করা যায় কি যেখানে দুইয়ের সুবিধেই পাওয়া যাবে?

এ যাবৎ ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন ধরা সেন প্রস্তাবিত এই আদর্শ সংমিশ্রণকে প্রত্যাখান করে এসেছে। তাদের বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সাধারণ শ্রমজীবিদের সক্ষমতার দিকে তেমন নজর দেয়া হয়নি। প্রথমে পুঁজির ও পুজিপতির সক্ষমতার বৃদ্ধির দিকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দরকার হলে সে জন্য এমনকি বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেও খর্ব করা হয়েছে (চিলির পিনোচেট সরকার, দক্ষিণ কোরিয়ার সামারিক সরকার, ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো সরকার ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সামগ্রিক জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে চুইয়ে পড়ে আস্তে আস্তে সাধারন জনগণের দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে এবং জনগনের ন্যুনতম মৌলিক অধিকার ও সক্ষমতাগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে যাত্রা শুরু হয়েছিল অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও অধিকারসমূহ জনগণের ব্যাপক অংশের মাঝে পুনর্বন্টনের মাধ্যমে। অনুমান করা হয়েছিল যে জনগণ সেগুলো দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদেরকে পূর্ণ সক্ষম করে তুলে তারা নিজেরাই স্বাধীন স্বশাসনের দিকে অগ্রসর হবেন এবং এক ধরনের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র সে সব দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে। মার্কসের কাম্য সমাজের যে সংজ্ঞা কমিউনিষ্ট ইশতেহারের আছে অর্থাৎ এমন সমাজ যেখানে সকল ব্যক্তির স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হবে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা, সেরকম সমাজকেই আদর্শ হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছিল। কিন্তু ঐসব দেশের দেশের "বিদ্যমান সমাজতন্ত্র" সেই ঘোষিত আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। অতএব অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে অপূর্ব সম্মিলনের কথা সেনের মানব উন্নয়ন ধারনায় আদর্শ হিসাবে উঠে এসেছে তার কোনো প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত বিশ্বে তৈরি হয়নি। মার্কসের অনুসারীরা এবং ধনতন্ত্রের অনুসারীরা উভয়েই অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে রাজনৈতিক অধিকার সীমিত বা খর্ব করতে দ্বিধা করেননি। প্রচলিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো তাদের উভয়ের কাছে একটি উপায় মাত্র। সেন যেভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার ও তদপ্রসুত বাক-ব্যক্তি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও অন্যান্য সক্ষমতাগুলোকে অন্তর্জাতভাবে (Intrinsically Valuable) মূল্যবান অধিকার হিসাবে গণ্য করেছেন তারা কেউই তা ঠিক সেভাবে গ্রহণ করেননি।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার অধিকার ও সক্ষমতা বৃদ্ধিই হওয়া উচিৎ মানব উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য।

এই বিষয়ে অবশ্য শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। শুধু এটুকু অন্তত: সবাই নিশ্চিতভাবে একমত হবেন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার অথিকার ও সক্ষমতা বৃদ্ধিই হওয়া উচিৎ মানব উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য। তবে এর মধ্যে কোনটি কতখানি মূল্যবান, একটির বদলে আরেকটিকে সাময়িকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কিনা, কোন পথে এগুলো দ্রুততমভাবে আদায় হবে, এসব জটিল প্রশ্নে বিতর্ক আছে এবং এই সব বিতর্কের কোন সার্বজনীন সাধারন মীমাংসা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

মানব উন্নয়নঃ তুলনামূলক পরিমাপের সমস্যা

মানব উন্নয়নের যে সংজ্ঞা মেস দিয়েছেন তা ব্যবহার করে বিভিন্ন মানব পরিস্থিতির তুলনা করার আগে কতকগুলো জরুরী সমস্যার মীমাংসা প্রয়োজন। প্রথমেই পরিমাপের মাত্রাগুলো নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ সক্ষমতা ও অধিকারের মধ্যে কোনগুলো মৌলিক বা প্রাথমিক সেগুলো বাছাই করা প্রয়োজন। প্রাথমিক বা মৌলিক বলতে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি সেই সক্ষমতা বা অধিকারগুলো যার নিশ্চয়তা ব্যতীত ব্যক্তির জন্য অন্য সক্ষমতা কিংবা অধিকারসমূহ কার্যত: অর্থহীন হয়ে যায়। মাত্রা নির্বাচনের পরে রয়েছে নির্বাচিত মাত্রাসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্নয়ের সমস্যা। অর্থাৎ ধরা যাক ব্যক্তি ক, ব্যক্তি খ এর তুলনায় এক নম্বর মৌলিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে উন্নত অবস্থানে আছেন, কিন্তু দুই নম্বর সক্ষমতার ক্ষেত্রে অনুন্নত অবস্থানে আছেন, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি ক এর সামগ্রিক মানব উন্নয়ন সূচক খ এর তুলনায় কম না বেশি তা নির্ণয় করার জন্য উভয় সক্ষমতার

তুলনামূলক গুরুত্ব নির্ধারন করতে হবে। এছাড়াও রয়েছে "অধিকার' বিষয়ক জটিলতা। অধিকার হচ্ছে এমন একটি প্রত্যয় যার পরিমাণীকরণ (Quantification) হয় অসম্ভব না হয় দুরূহ। সর্বশেষে বলা যায় যে উপরোক্ত সকল সমস্যাবলীর সমাধান যদি আমরা করতেও পারি তাহলে প্রশ্ন উঠবে এটা কি কতিপয় ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে নাকি ব্যক্তি সমষ্টি তথা সমাজ বা দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয়টি যদি অধিকতর অর্থবহ হয় (কারণ যে কোন দেশের শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত কতিপয় ব্যক্তির সক্ষমতা সূচক যদি বেশ উঁচুতে থাকে তাই বলে সে দেশের সামগ্রিক মানব উন্নয়ন সূচক ও উঁচুতে রয়েছে, এমন বিবেচনা করা সঠিক হবে না)। তাহলে কিভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে পরিমেয় মানব উন্নয়ন সূচকগুলো থেকে সমগ্র সমাজে অথবা দেশের সমষ্টিগত মানব উন্নয়ন সূচক নির্ণয় করা যাবে, তারও একটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি থাকা চাই। এখানে সমস্যাগুলো সমাধানের রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো কি? মৌলিক সক্ষমতাগুলো কি?

আগের আলোচনার দেখিয়েছি সেন প্রাথমিকভাবে যে সক্ষমতাগুলোকে নির্বাচন করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ক্ষমতা এবং অধিকার, শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা ও অধিকার এবং একটি ন্যুনতম স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাত্রা মানের অধিকার বা ক্ষমতা। আমরা এই মাত্রাগুলোকে অপ্রত্যক্ষভাবে পরিমাপযোগ্য ধরে নিতে পারি। প্রথমটির অপ্রত্যক্ষ্য পরিমাপ হবে সম্ভাব্য প্রত্যাশিত আয়ু যা নানাভাবে মাপা হতে পারে, দ্বিতীয়টির পরিমাপক হবে 'শিক্ষান্তর' বা নানা ভাবে মাপা যেতে পারে এবং তৃতীয়টি যেহেতু অনেক পরিমানে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের উপরেই নির্ভর করে সেহেতু এর অপ্রত্যক্ষ পরিমাপ হতে পারে 'প্রকৃত আয়"। এই তিনটি সংখ্যার গড়কে ব্যক্তি মানুষের মানব উন্নয়ন সূচক হিসাবে ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে জনসমষ্টির গড় বের করে সমগ্র সমাজ বা দেশের মানব উন্নয়ন সূচক নির্মাণ সম্ভব। স্বভাবতই এ ধরনের বিমূর্ত সামুষ্টিক পরিমানীকরণে অনেক রূপান্তরমূলক ত্রুটি (Reductionist Fallacy) রয়েছে। যেমন, এই পদ্ধতিতে একটা দেশের মানব উন্নয়ণ সূচক শতকরা পাঁচ ভাগ লোকের ক্ষেত্রে খুব কম হলেও, গড়ে সে দেশের মানব উন্নয়ন সূচক মাঝামাঝি মাত্রার বলে প্রতিভাত হতে পারে। অবশ্য 'গড়ের' এই ফাঁকির বিষয়ে মানব উন্নয়ন পরিমাপকরা সচেতন আছেন।

অবশ্য 'গড়ের' এই সমস্যার সমাধান সহজেই সম্ভব এবং ১৯৯৮ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিতদের বঞ্চনা সূচক আলাদা করে নির্নয়ের উদ্যোগও ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে মানব দারিদ্র্য সূচক (Human Poverty Index) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বস্তুত: মানব উন্নয়ন ধারনাকে সর্বপ্রথম ক্রিয়াশীল (Operationlize) করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় জাতিসংঘের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউএনডিপি থেকে প্রকাশিত "Human Development Report"্ এ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-এ। ১৯৯০ সালে প্রণীত প্রথম "Human Development Report" এ মানব উন্নন প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, "জনগণের সুযোগের পরিধি প্রসারের প্রক্রিয়া " হিসাব। যে সুযোগগুলোকে 'ক্রিটিকাল' বা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে নির্বাচন করা হয় সেগুলো ছিল একটি দীর্ঘ সুস্থ জীবনযাপনের সুযোগ, নিজের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে জানার্জনের সুযোগ এবং সম্পত্তি, কাজ ও আয়ের এমন সুযোগ যার ফলে একটি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য জীবনযাত্রা মান (Adecent standard of living) অর্জন সম্ভব হবে। বস্তুত: আয়ু, শিক্ষা ও ন্যুনতম আয় এগুলোই হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার ও মৌলিক সক্ষমতা। এগুলো যে সমাজে যত সার্বজনীন হবে, যত উঁচু হবে এবং যত সুষ্ঠুভাবে বন্টন হবে ততই সে সমাজ মানবিক উন্নয়নের মৌলিক মানদন্ডে উচ্চতর অবস্থানে অবস্থান করবে।

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে পরিমাপের সুবিধার জন্য আয়ু মাপা হয়েছে "গড় আয়ু প্রত্যাশা" দ্বারা। শিক্ষা মাপা হয়েছে দেশের গড় সাক্ষরতার হার এবং গড় স্কুল গমন বছরে একটি যৌগিক সূচকের দ্বারা এবং আয় মাপা হয়েছে গড় মাথা পিছু আয়ের ক্রমহ্রাসমান মূল্যায়নের দ্বারা।

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে পরিমাপের সুবিধার জন্য আয়ু মাপা হয়েছে "গড় আয়ু প্রত্যাশা" (Average life Expectancy) দ্বারা। শিক্ষা মাপা হয়েছে দেশের গড় সাক্ষরতার হার এবং গড় স্কুল গমন বছরের (Mean Schooling Year) একটি যৌগিক সূচকের দ্বারা এবং আয় মাপা হয়েছে গড় মাথা পিছু আয়ের ক্রমহ্রাসমান মূল্যায়নের দ্বারা। অর্থাৎ যেসব দেশের গড় মাথাপিছু আয় দারিদ্র্য আয়ের চেয়ে কম তাদের গড় আয়ের মূল্যের গুরুত্ব বেশি দেয়া হয়েছে এবং যেসব ধনী দেশের গড় আয় দারিদ্র্য আয়ের চেয়ে উপরে তাদের গড় আয়ের মূল্যের গুরুত্ব ক্রমশ: হ্রাস পেয়ে এক পর্যায়ে এসে তাকে শূন্য ধরা হয়েছে। এ কথা বলা যাবে না যে এই ধরনের পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তাই যে ২৬টি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন এ যাবৎ ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রতিবছর হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটিকেই পরিমাপ পদ্ধতির পরিমার্জন করা হয়েছে। যাতে মানব উন্নয়নের আরো অন্যান্য বিভিন্ন দিকগুলো এর অন্তর্ভূক্ত হয় এবং সূচকটি নানারকম বন্টনগত দিকের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল (Distribution sensitive) হয় সেজন্য এর প্রনেতারা আক্লান্ত সৃজনশীল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মানব উন্নয়ন সূচক সম্পর্কে যার যে সমালোচনাই থাকুক না কেন, এর যত 'অসম্পূর্ণতা' এবং 'গড়-করনের' ত্রুটিই থাকুক না কেন এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে "উন্নয়নের" প্রচলিত বস্তুগত প্রাচুর্যের ধারনার প্রতিস্থাপন। বিশ্বব্যাংক

প্রাচুর্যের বদলে মানব সক্ষমতাকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপনের নীতিটি বিশ্বব্যাংকের তথাকথিত "কঠিন অর্থনীতির" কাছেও আজ আর পরিত্যাজ্য থাকছে না।

প্রণীত 'বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টের" পাশাপাশি ইউএনডিপি প্রণীত "মানব উন্নয়ন রিপোর্ট" আজ সমাদরে বহু দেশের নীতি প্রণেতাদের কাছে আকর গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। অধিকন্তু লক্ষ্য করা যায় যে বস্তুগত প্রাচুর্যের বদলে মানব সক্ষমতাকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপনের নীতিটি বিশ্বব্যাংকের তথাকথিত "কঠিন অর্থনীতির" (Hard Economics) কাছেও আজ আর পরিত্যাজ্য থাকছে না। গাণিতিক শুদ্ধতার দোহাই দিয়ে নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা একে আর বিবেচনার বাইরে রাখতে পারছেন না।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশের দশ বছর আগে সেন তার একটি চমকপ্রদ প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ তুলনামূলক ভাবে অনেক কম মাথাপিছু আয় নিয়েও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমান বা বেশি এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এই তথ্য তখন প্রমান করেছিল যে বিশেষ ধরনের উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলে গরীব দেশগুলো আয়ের নিম্নতর স্তরেই অধিকতর মানবিক পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবেন। এই সহজ অথচ বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তটি তুলে ধরার জন্য এ.কে. সেন যে চমকপ্রদ সারণীটি তার প্রবন্ধে ব্যবহার করেছিলেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে তা এখানে পুনারায় তুলে ধরা হল।

সারণী ৯.১ ঃ জন্মের সময় গড় প্রত্যাশিত আয়ু ও মাথাপিছু জি.এন.পি

দেশ	জন্মের সময় গড়প্রত্যাশিত আয়ু, ১৯৮০ (বছর)	মাথাপিছু জি.এন.পি, ১৯৮০ (ডলার)
ব্রাজিল	৬৩	২০৫০
চীন	৬৪	২৯০
মেক্সিকো	৬৫	২০৯০
দ: কোরিয়া	৬৫	৯৭০০
শ্রীলংকা	৬৬	২৭০

উৎস: এ.কে.সেন,প্রাগুক্ত, ১৯৯০, পৃঃ ৯৪

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১৯৮০ সালে ব্রাজিল, মেক্সিকো বা দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় শ্রীলংকা ও চীন, মাথাপিছু আয়ের নিরিখে গড়ে ৭ থেকে ৩৫ গুন পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও চীন এবং

মানব উন্নয়নের জন্য কাম্য প্রবৃদ্ধির চরিত্র হতে হবে কর্মমুখী দারিদ্র্য নিরসনকারী সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ টেকসই , জেন্ডার সংবেদনশীল এবং সর্বোপরি মানবিক

শ্রীলংকা উভয় দেশের মানুষদের গড় আয়ু উচ্চ আয়ের দেশগুলোর প্রায় সমান বা বেশি। বিষয়টি সেন ১৯৮০ সালে নজরে আনার পর এ নিয়ে বিস্তর হৈ-চৈ হয়েছে। বহু বিতর্কের পর বর্তমানে এ কথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, "প্রবৃদ্ধির জন্য প্রবৃদ্ধি" এই নীতির কোন সার্থকতা নেই। অসম প্রবৃদ্ধি বা নিষ্ঠুর প্রবৃদ্ধি, পরিবেশ বিধ্বংসী বা ভবিষ্যত সম্ভাবনাহীন প্রবৃদ্ধি, শেকড়বিহীন প্রবৃদ্ধি ও অসহায় প্রবৃদ্ধি এগুলোর কোনটিই মানব উন্নয়নের জন্য কাম্য নয়। মানব উন্নয়নের জন্য কাম্য প্রবৃদ্ধির চরিত্র হতে হবে কর্মমুখী, দারিদ্র্য নিরসনকারী, সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ, টেকসই, জেন্ডার সংবেদনশীল এবং সর্বোপরি মানবিক সক্ষমতার পরিবর্ধক। যেসব উন্নয়নশীল দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সোনার হরিনের পিছনে না ছুটে মানবিক সক্ষমতার বৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তাদের অর্জিত সাফল্যের পরিমাণ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জক দেশগুলোর তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। ২০১৮ সালের সর্বশেষ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে তৈরী ৯.২ নং সারণী আমাদের দৃষ্টিকে আরজও সেই সত্যের দিকেই আকৃষ্ট করছে।

সারণী ৯.২ ঃ বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন সূচক, ১৯৯৫, ২০১৮

দেশ	জন্মের সময় গড়প্রত্যাশিত আয়ু		প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষতার হার		মাথাপিছু আয় জি.এন.পি, (ডলার)	
	১৯৯৫	২০১৮	১৯৯৫	২০১৮	১৯৯৫	২০১৮
ক.ব্রাজিল	৬৬.৬	৭৫.৭	৮৩.৩	৯১.৭	৫৯২৮	১৩,৭৫৫
ভিয়েতনাম	৬৬.৪	৭৬.৫	৯৩.৭	৯৩.৫	২৪০	৫৮৫৯
খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭৬.৪	৭৯.৫	৯৯.০	৯৯.০	২৬৯৭৭	৫৪,৯৪১
কিউবা	৭৫.৭	৭৯.৯	৯৫.৭	৯৯.৮	৩১০০	৭৫২৪
গ.শ্রীলংকা	৭২.৫	৭৫.৫	৯০.২	৯১.২	৭০০	১১,৩২৬
ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া	৭১.৭	৮২.৪	৯৮.০	৯৯.২	৯৭০০	৩৫,৯৪৫

উৎস: মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৮, (পৃঃ-১২৮-২৯, ১৮৪-৮৫).২০১৮

সর্বশেষ প্রাপ্ত ২০১৮ এবং ১৯৯৫ সালের তথ্যমালার ভিত্তিতে প্রণীত উপরোক্ত তালিকায় আমরা তিন জোড়া দেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের পারস্পরিক তুলনাচিত্র উপস্থাপন করেছি। উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, ভিয়েতনামের মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ব্রাজিলের তুলনায় পঁচিশ ভাগের এক ভাগ কিন্তু ভিয়েতনামে সাক্ষরতার হার ৯৩.৭ শতাংশ, অথচ ব্রাজিল তা আরো কম ৮৩.৩ শতাংশ। ভিয়েতনামে মানুষের গড় আয়ু ৬৬.৪ বছর, ব্রাজিলে তা ৬৬.৬ বছর। পৃথিবীর মহাশক্তিধর দেশ আমেরিকার তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দুর্বল দেশ কিউবার মাথাপিছু আয় হচ্ছে আমেরিকায় নয় ভাগের এক ভাগ (এটা অবশ্য ক্রয় ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে Purchasing power party-র ভিত্তিতে হিসাবকৃত)। কিন্তু কিউবার সাক্ষরতার হার প্রায় ৯৬ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রে তা ৯৯। আমাদের পাশের দেশ শ্রীলংকার মাথাপিছু আয় দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় প্রায় ১৪ ভাগের এক ভাগেরও কম। কিন্তু লংকাবাসীর গড় আয়ু কোরিয়াবাসীর তুলনায় এক বছর বেশি। শ্রীলংকায় সাক্ষরতার হার ৯০.২ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় তা ৯৮ শতাংশ। সুতরাং অপেক্ষাকৃত কম আয় ও সম্পদ নিয়েও একটি দেশ উন্নত মানবিক সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এটি আজো সমান সত্য।

সারসংক্ষেপ

মানব উন্নয়ন নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায় বা বস্তুগত প্রাচুর্য হলেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানব

উন্নয়নের ধারনার অন্যতম প্রবক্তা নোবেল বিজয়ী বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ এ কে সেনের মতে মানুষের সবরকম স্বাধীনতার বিস্তৃতি ও বিকাশই হচ্ছে মানব উন্নয়ন। কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য মানুষের ন্যূনতম কিছু সক্ষমতা থাকা দরকার। এসব ন্যূনতম সক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা। এছাড়া সম্পদের উপর অধিকার এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের অধিকারও মানব উন্নয়নের জন্য জরুরী। বর্তমানে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ইউ.এন.ডি.পি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে "মানব উন্নয়ন রিপোর্ট"। এই রিপোর্ট মানব-উন্নয়নের সূচক মাপা হয় এবং প্রকাশ করা হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য থেকে এ কথা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে পৃথিবীতে অনেক দেশই আছে যেখনে মাথাপিছু আয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে সে অনুপাতে দেশের সাধারণ মানুষের মানবিক উন্নয়ন হয় নি। ২০১৮ সনে প্রকাশিত "বিশ্ব মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে" মানব উন্নয়নের সূচকের মাত্রার মানদন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯টি দেশের মধ্যে প্রায় নিচের দিকে ১৩৬তম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. মানব উন্নয়ন এর আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে-
   ক. সকল মানুষের সকল প্রকার স্বাধীনতার বিকাশ;
   খ. সকল মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা;
   গ. সকল মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা।

২. সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্বের প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে-
   ক. জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির উপরেই এক পেশে মনোযোগ;
   খ. সম্পদ বা প্রাচুর্যকে উন্নয়নের একটি উপাদান গণ্য করা;
   গ. সুষম বন্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ।

৩. দীর্ঘমেয়াদী বিচারে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি আদর্শ সমাজে-
   ক. পরস্পর বিরোধী; খ. পরস্পর পরিপূরক; গ. পরস্পর সম্পর্কহীন।

৪. জাতিসংঘের ইউ.এন.ডি.পি অফিস থেকে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন মানব উন্নয়নের মাত্রা তিনটি হচ্ছে-
   ক. আয়, ভোগ ও সঞ্চয়; খ. আয়, আয়ু ও জ্ঞান; গ. আয়, সম্পদ ও গণতন্ত্র।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. মানব উন্নয়নের সূচকটি কিভাবে প্রণীত হয়েছে?
২. মানব উন্নয়ন ও সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২। মানব উন্নয়ন পরিমাপে কি কি সমস্যা উদ্ভুত হয় আলোচনা করুন।

পাঠ-৯.২ ঃ মানব উন্নয়ন : সাম্প্রতিক প্রবণতাসমূহ, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থানে

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশের মানব উন্নয়নে প্রারম্ভিক প্রবণতাসমূহ;
- দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান।

বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন ঃ প্রারম্ভিক প্রবণতাসমূহ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন মাত্রার কালানুক্রমিক চিত্র ১৯৯০ সালের পর থেকে ইউএনডিপি প্রকাশিত বার্ষিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনগুলোতে বিধৃত রয়েছে। আট বছর কোনো দীর্ঘ সময় নয়। তদুপরি তথ্য আহরনের তিন বছরের একটি সময় ব্যবধান রয়েছে। তাই ১৯৯৭ সালে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাতে বিধৃত রয়েছে ১৯৯৪ সালের তথ্য। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ মাত্র এই সাত বছরের জন্য বাংলাদেশের মানব উন্নয়নের জন্য গতিপ্রবনতা সম্পর্কে কিছু ধারনা এসব রিপোর্টের প্রদত্ত তথ্যাবলী থেকে অর্জন করা সম্ভব। যেহেতু একই উৎস থেকে বিশ্বব্যাপী তুলনীয় এই প্রতিবেদনগুলো প্রকাশিত হয়ে আসছে, সেজন্য সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষত: সার্কভূক্ত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতির চিত্রটি সম্পর্কেও এসব রিপোর্ট থেকে একটা ধারনা অর্জন করা সম্ভব। আমরা প্রথমে দৃষ্টিপাত করব বিশেষভাবে বাংলাদেশের মানব উন্নয়নের গতি প্রবণতার প্রতি এবং পরবর্তীতে নজর দেয়া হবে। সার্কভূক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বশেষ মানব উন্নয়ণ পরিস্থিতির তুলনামূলক মূল্যায়নের উপর। আলাদাভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানব উন্নয়ন চিত্রটি পেলে আমাদের এই তুলনা আরো যথার্থ হতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি ভারত থেকে আলাদাভাবে জোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

যারা মানব উন্নয়ন ক্রমসারিতে মাথাপিছু আয়ের ক্রমসারির তুলনায় উচ্চতর অবস্থানে রয়েছেন তারা আসলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হারে মানব উন্নয়নমুখী করতে সক্ষম হয়েছে।

১৯৯০ সালে যখন প্রথম আর্ন্তজাতিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তখন বিশ্বের মোট ১৩০টি দেশকে মানব উন্নয়নের মাত্রা অনুযায়ী ক্রমানুসারে সারিবদ্ধ করা হয়েছিল। এর একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। কারণ এর আগে উত্তরের দেশগুলো উচ্চ মাথাপিছু আয়ের কারণে সর্বদাই উন্নতির প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত হতেন, কিন্তু এই নতুন সূচকানুসারে সেই ক্রমাবস্থান আমুল বদলে যায়। এর তাত্ত্বিক তাৎপর্য আমরা অবশ্য পূর্ব্যবর্তী অধ্যায়ে আগেই আলাপ করেছি। এই প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দুটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রথমত: মাথাপিছু আয়ের মাপকাঠিতে উন্নতির উচ্চতর সোপানে স্থানপ্রাপ্ত অনেকগুলো দেশ মানব উন্নয়ন সূচকের নতুন নিরিখে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সোপানে নেমে যেতে বাধ্য হয়। আবার উল্টা থেকে অনেকগুলো নিম্ন মাথাপিছু আয়ের দেশ তাদের পুরাতন নিম্নতর সোপান থেকে নতুন বিধির ফলে মানব উন্নয়ন দ্বারা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সোপানে উঠা আসতে সক্ষম হয়। এই ধরনের উর্ধ্বগমন বা নিম্নগমনের একটি সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন রণনীতিগত তাৎপর্য (Strategic Singnificance) রয়েছে। যারা মানব উন্নয়ন ক্রমসারিতে মাথাপিছু আয়ের ক্রমসারির তুলনায় উচ্চতর অবস্থানে রয়েছেন তারা আসলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হারে মানব উন্নয়নমুখী করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৭ সালে পৃথিবীব্যাপি তুল্য ১৩০টি দেশের মধ্যে ধরা যাক একটি দেশ মাথাপিছু আয়ের নিরিখে ৪র্থ স্থানে আছে কিন্তু মানব উন্নয়নের নিরিখে তার অবস্থান দাঁড়িয়েছে পঞ্চম, সে ক্ষেত্রে এই দুই ক্রমসারির (Rank Order) ব্যবধান হবে ঋণাত্মক। এ ধরনের ঋণাত্মক ব্যবধানের তাৎপর্য হচ্ছে এই দেশটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমানুপাতে মানব উন্নয়নে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু উল্টোভাবে যদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমানুপাতে মানব উন্নয়নে পরিনত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু উল্টোভাবে যদি দেশের মাথাপিছুর আয়ের ক্রমসারিমান (Rank Order Value) হতো পঞ্চম এবং মানব উন্নয়ন নিরিখে ক্রমসারিমান হতো চতুর্থ এবং তখন ব্যবধান হতো ধনাত্মক।

তাহলে আমরা বলতাম যে দেশটি অর্থনৈতিক উন্নতিকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে মানব উন্নয়নে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব একটি দেশের মানব উন্নয়নের রণকৌশল সাফল্য পরিমাপের জন্য আমরা একটি সহজ সূত্রের সাক্ষাৎ পাচ্ছি।

যদি উল্লিখিত দুই ক্রমরাশিমানের ব্যবধান ইতিবাচক হয় এবং তা ক্রমশ: বাড়তে থাকে তাহলে প্রমানিত হবে যে দেশটি মানব উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অপেক্ষাকৃত অধিকার হারে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মানব উন্নয়নে রূপান্তরিত করেছে। পক্ষান্তরে ব্যবধানটি যদি নেতিবাচক হয় এবং তা বাড়তে থাকে তাহলে উল্টোটা বুঝতে হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে এগুলেও দেশটি ক্রমাগত মানব উন্নয়ন মানদন্ডে পৃথিবীর বুকে পিছিয়ে যাচ্ছে।
৯.৩ নং সারণীতে এই সূত্রটি প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত তথ্যাবলী ধরা হলো।

সারণী ৯.৩ : বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় সূচক ও মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রমরাশিমানের গতি প্রবণতা

পরিমাপের বছর (তথ্য বছর)	তুলনীয় দেশের সংখ্যা	মাথাপিছু আয় সূচকের ক্রমরাশিমান	মানব উন্নয়নে সূচকের ক্রমরাশিমান	ব্যবধান (৩-৪)
১৯৯০ (১৯৮৭)	১৩০	১২৪	১০৭	(+) ১৭
১৯৯১ (১৯৮৫-৮৮)	১৬০	১৫৫	১৩৬	(+) ১৯
১৯৯২ (১৯৯০)	১৬০	১৫০	১৩৫	(+) ১৫
১৯৯৩ (১৯৯০)	১৭৩	১৫৯	১৪৭	(+) ১২
১৯৯৪ (১৯৯২)	১৭৩	১৫৯	১৪৬	(+) ১৩
১৯৯৫ (১৯৯২)	১৭৪	১৪১	১৪৬	(-) ৫
১৯৯৬ (১৯৯৩)	১৭৪	১৪০	১৪৩	(-) ৩
১৯৯৭ (১৯৯৪)	১৭৫	১৪৪	১৪৪	০

উৎস: *UNDP, April, 1998 b.*

১৯৯২ এবং ১৯৯৩ উভয় সালেই বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকগত অবস্থান, মাথাপিছু আয়গত অবস্থানের নিচে নেমে যাওয়ায় "ব্যবধান"টি অবশেষে নেতিবাচক হয়ে পড়েছিল। যদিও ১৯৯৪ সালে তা আবার শূন্যে পৌঁছায় কিন্তু এখনও তা ইতিবাচক নয়।

৯.৩ নং সারণীতে ৫ নং স্তম্ভ থেকে দেখা যায় যে ১৯৮৭-৯২ কালপর্বে প্রতিটি বছরই পূর্বে বর্ণিত ব্যবধানটি ছিল ইতিবাচক। এ থেকে সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে আশির দশকের শেষ দিকে এবং নব্বই দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশ উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে মানবিক অগ্রগতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে ব্যবধান ইতিবাচক থাকলেও এই সময় তা শুধু একবার বৃদ্ধি পেয়ে তারপর থেকে তা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। বস্তুত: ১৯৮৭ সালের পরের বছর ৩০টি নতুন দেশ তালিকাভূক্ত হয়ে তুলনার ভেতরে চলে আসে। ফলে বাংলাদেশের উভয় ক্রমরাশিমানের বিপুল অবনতি ঘটে। মাথাপিছু আয়ের মইরে বাংলাদেশ নেমে আসে ১২৪ থেকে ১৫৫-এ অর্থাৎ ৩১ ধাপ নিচে। পক্ষান্তরে মানব উন্নয়ন মইয়ের ক্ষেত্রে তা নেমে আসে ১০৭ থেকে ১৩৬-এ অর্থাৎ ২৯ ধাপ। সেই হিসাবে একে সামান্য অগ্রগতি বলা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, দৃশ্যমান উন্নয়নটি হয়েছে মানব উন্নয়ন সূচকের তুলনামূলকভাবে কম অবনতির দ্বারা, তুলনামূলকভাবে অধিক উন্নতির দ্বারা নয়। কিন্তু এর পর থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ের এই মই বেয়ে যতখানি নিচে নেমেছে (১৯৯০ এর ব্যতিক্রম ছাড়া) সেই তুলনায় মানব উন্নয়ন মই বেয়ে নিচে নেমেছে অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই ইতিবাচক ব্যবধানটি শুধু একবারই ১৭ থেকে ১৯-এ বেড়ে তারপর ক্রমাগত কমতে কমতে ১৯৯২ সালে এসে দাঁড়িয়েছে + ১৩'তে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগজনক সংবাদ হচ্ছে, ১৯৯২ এবং ১৯৯৩ উভয় সারেই

বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকগত অবস্থান, মাথাপিছু আয়গত অবস্থানের নিচে নেমে যাওয়ায় "ব্যবধান"টি অবশেষে নেতিবাচক হয়ে পড়েছিল। যদিও ১৯৯৪ সালে তা আবার শূন্যে পৌঁছায় কিন্তু এখনও তা ইতিবাচক হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ ১৯৯২ পরবর্তীকালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে

তাল মিলিয়ে মানব উন্নয়ন অগ্রসর হয়নি। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রতিবেদক তাই সিদ্ধান্ত টেনেছেন;

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রবৃদ্ধি অনুযায়ী সমাজের দরিদ্রতম অংশগুলোর উপকার হয়নি এবং এদের নিম্নমাত্রার স্বাস্থ্যগত ও শিক্ষাগত অর্জনই সারা দেশের মানব উন্নয়ন সূচককে নিম্নস্তরে দাবিয়ে রেখেছে। [ইউএনডিপি ১৯৯৮, পৃ: ১৩]।

পূর্বোক্ত আলোচনায় যে কথা স্পষ্ট হয়েছে তা হচ্ছে সম্প্রতি (অর্থাৎ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত) আমরা মাথাপিছু গড় আয় এবং গড় মানব উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের অবস্থান সারা বিশ্বে যথাক্রমে ১৫৯ ও ১৪৭ তম ধাপ থেকে ১৪৪ তম ধাপে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। অর্থাৎ মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে যেখানে আমরা ১০ ধাপ অগ্রসর হয়েছি সেখানে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৩ ধাপ। এই উন্নয়ন ধারা চালু থাকলে আমরা হয়তো আরো প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে থাকবো কিন্তু তা ইস্পিত চরিত্রের হচ্ছে কি? এর একটি সম্ভাব্য উত্তর ইতোমধ্যেই ১৯৯৮ এর বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে। সেটি খুব সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় এই যে, বিরাজমান কাঠামোগত বৈষম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমানুপাতে মানব উন্নয়নে পরিণত করা সম্ভব নয়।

বিরাজমান কাঠামোগত বৈষম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমানুপাত মানব উন্নয়নে পরিণত করা সম্ভব নয়।

সুতরাং বিরাজমান কাঠামোগত বৈষম্যের কারণটি কিভাবে প্রবৃদ্ধিকে মানব উন্নয়নে রূপান্তরিত হতে দেয় না তার একটি নিকট এবং গভীর বিশ্লেষন হওয়া আজকে জরুরীভাবে প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান সমাজে যারা ক্ষমতাবান ও অর্থশালী তাদের এ ধরনের গবেষনা বা বিশ্লেষনের কোন চাহিদা নেই, এক অর্থে তাদের চাহিদা বরং নেগেটিভ। অন্যদিকে কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে পীড়িত শ্রেণীগুলোর জন্য এ ধরনের বিশ্লেষণলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন থাকলেও এর কোন কার্যকর চাহিদা (effective demand) তাদের তরফ থেকে আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। এমতাবস্থায় বঞ্চিতদের জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপরোক্ত বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে সেই জ্ঞানকে পরিবর্তনের হাতিয়ারে পরিণত করার দায়িত্ব বর্তায় মধ্যস্তরের সেই সব সদস্য বিশেষজ্ঞদের উপর দারা মানব উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সে ধরনের একটি আলোকিত মধ্যস্তর পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর দেখা গেলেও আমাদের দেশে তা ক্রমশ: বিরল প্রজাতির সদস্যে পরিণত হচ্ছে। অগত্যা এখানে তবু একটি প্রাথমিক প্রয়াস নেয়া হলো।

বাংলাদেশের কাঠামোগত বৈষম্য ঐতিহাসিকভাবে তিনটি ক্ষেত্রে বিরাজমান। আয় বা সম্পদের বন্টনে বৈষম্য, শহর ও গ্রামের মধ্যে আঞ্চলিক অবস্থানজনিত বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বিষম্য।

বাংলাদেশের কাঠামোগত বৈষম্য ঐতিহাসিকভাবে তিনটি ক্ষেত্রে বিরাজমান। আয় বা সম্পদের বন্টনে বৈষম্য, শহর ও গ্রামের মধ্যে আঞ্চলিক অবস্থানজনিত বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য। প্রগতিশীল বামপন্থিরা এ যাবৎ প্রথমটি অর্থাৎ আয় ও সম্পদ বৈষম্য নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামালেও পরবর্তী দুটি ক্ষেত্র নিয়ে তেমন সরব হননি। পক্ষান্তরে মানব উন্নয়নপন্থীরা প্রথম থেকেই আঞ্চলিক বৈষম্য, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য সহ আয় বা সম্পদ বৈষম্যের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। ১৯৯৮ সালের বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গত দশ বছরে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বন্টন বৈষম্য মোটেও হ্রাস পায়নি। বরঞ্চ অতি সম্প্রতি তা বেড়েছে। বর্তমানে দেশের ৫ শতাংশ ভাগ্যবানের অধীনে চলে যাচ্ছে ১৯ শতাংশ জাতীয় আয়, নিচের দুর্ভাগা ৪০ শতাংশের অধীনে থাকছে মাত্র ১৭ শতাংশ। ১৯৯৮ সালে ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্যকে বিবেচনায় নিয়ে যখন বাংলাদেশের মানব উন্নয়নসূচকগুলো পুন: পরিমাপ করা হলো, তখন দেখা গেল ১৯৯৪-১৯৯৫ মাত্র এই এক বছরেই মানব উন্নয়ন মাত্রা এক হিসাবে হ্রাস পেয়েছে ৩.৭৬ শতাংশ এবং দ্বিতীয় হিসাবে এই হ্রাসের আপেক্ষিক পরিমান আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৬৩ শতাংশ। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদক তার ১৯৯৮ সালের রিপোর্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন:

১৯৯৪ সালে নারীদের মানব উন্নয়ন সূচকের মান (.৩৩) এর তুলনায় পুরুষদের মানব উন্নয়নসূচক মান (.৪৪) ছিল ২৫ শতাংশ বেশি।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পরিমেয় বাংলাদেশের আয়-বন্টন সংবেদশীল মানব উন্নয়ন সূচকের অবনতি হার ছিল ৩.৭৬ শতাংশ, দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পরিমেয় সূচকের অবনতির হার ছিল ৭.৩৬ শতাংশ। অবনতির হারের এই পার্থক্যের জন্য দায়ী হচ্ছে পরিমাপ পদ্ধতির বিভিন্নতা। পরিবর্তনের মাত্রা পদ্ধতি ভেদে কম বেশি যাই হোক না কেন পরিবর্তনের অভিমুখীনতাটি কিন্তু সুস্পষ্ট এবং তাৎপর্য উদ্বেগজনক-বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন হয়তো ক্রমশঃ আরো বর্ধিত হারে বৈষম্যমূলক হয়ে যাচ্ছে। ইউএনডিপি, ১৯৯৮ b. পৃঃ ৯]

একইভাবে আমরা যদি বাংলাদেশের নারীদর এবং পুরুষদের মানব উন্নয়ন সূচক আলাদাভাবে পরিমাপ করে তুলনা করি তাহলে লক্ষ্য করবো যে ১৯৯৪ সালে নারীদের মানব উন্নয়ন সূচকের মান (.৩৩) এর তুলনায় পুরুষদের মানব উন্নয়নসূচক মান (.৪৪) ছিল শতাংশ বেশি। ১৯৯৫ সালে যেহেতু নারীদের মানব উন্নয়ন সূচক আরো খানিকটা হ্রাস পেয়েছিল অথচ পুরুষদের সূচকটি স্থির থেকে গিয়েছিল, সেহেতু মানব উন্নয়নের সামগ্রিক সূচকের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান ১৯৯৫ সালে আরেকটু বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ শতাংশ।

সর্বশেষ বৈষম্যের ক্ষেত্র গ্রাম-শহরের মানব উন্নয়ন সূচকের বৈষম্য অবশ্য ১৯৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৫ সালে খুবই সামান্য হ্রাস পেয়েছে। এই সামান্য হ্রাস পাওয়ার পরও বিদ্যমান বৈষম্যের মাত্রা যে কত গভীর তা এখানে দেয়া তথ্যাবলী থেকে স্বত:প্রতীয়মান। ১৯৯৫ সালে গ্রামের অধিবাসীদের প্রত্যাশিত আয়ু যেখানে ছিল ৫৭.৯ বছর, শহরবাসীর জন্য সেখানে গড়ে তা ছিল ৬০.৯ বছর। গ্রামবাসীর গড় সাক্ষরতার যে হার ছিল ৩৩.৬ শতাংশ, শহরবাসীর ক্ষেত্রে সেই একই হার চিল ৬০ শতাংশ। গ্রামবাসীর গড় সাপ্তাহিক আয়ের তুলনায় শহরবাসীর গড় সাপ্তাহিক আয় ছিল প্রায় ৩৪ শতাংশ বেশি।

বন্টনের দিকটি অবহেলা করে গড় মানব উন্নয়ন সূচককে বাড়ানোর সম্ভাবনা শুধু আমাদের দেশ নয়, সর্বত্রই খুবই সীমিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মানব উন্নয়নের পথে এক সঙ্গে দুটি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। এমন উন্নয়ন কৌশল আমাদের গ্রহণ করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক উন্নতি ক্রমবর্ধমান হারে মানব উন্নয়ন সূচককে বাড়ানোর সম্ভাবনা শুধু আমাদের দেশ নয়, সর্বত্রই খুবই সীমিত।

দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান

দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভূক্ত দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা। মালদ্বীপ, আফগানিস্তান ও ইরানও ভৌগোলিক অর্থে দক্ষিণ অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু তথ্যাভাবের কারণে এদেরকে আমরা আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করিনি।

আলোচ্য দেশগুলোতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ লোক বাস করেন। এদের আবার সত্তর ভাগ বাস করেন গ্রামে। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এই অঞ্চলে দ্রুতই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে অশিক্ষিত, সবচেয়ে পুষ্টিহীন এবং সবচেয়ে নারী-বিদ্বেশী অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে। এই উদ্বেগজন এলাকার একটি জনবহুল গ্রাম প্রধান দেশ হচ্ছে বাংলাদেশে। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের হিসাবানুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় সারা পৃথিবীর ২২ শতাংশ লোক বাস করেন। অথচ তাদের সম্মিলিত আয়ের পরিমাণ পৃথিবীর আয়ের মাত্র ১.৩ শতাংশ। বর্তমানে সারা বৃথিবীর দরিদ্র মানুষদের প্রায় ৪০ শতাংশ এই অঞ্চলেই বসবাস করেন। গোটা পৃথিবীর নিরক্ষর জনগণের ৪৬ শতাংশ এই অঞ্চলেই বসবাস করেন। দক্ষিণ এশিয়া বাদে পৃথিবীর বাকী অংশে বিদ্যালয় বর্হির্ভূত শিশুর যে মোট সংখ্যা রয়েছে, একমাত্র দক্ষিণ এশিয়াতেই রয়েছে তার চেয়ে বেশি। এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে কম উন্নত অঞ্চল হিসাবে কুখ্যাত সাব-সাহারান আফ্রিকায় পুষ্টিহীন কম ওজনের

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের হিসাবানুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় সারা পৃথিবীর ২২ শতাংশ লোক বাস করেন। অর্থচ তাদের সম্মিলিত আয়ের পরিমাণ পৃথিবীর আয়ের মাত্র ১.৩ শতাংশ।

শিশুদের আপেক্ষিক পরিমাণ যেখানে মোট শিশুর ৩০ শতাংশ সেখানে দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও সেই হারটি হচ্ছে আরো বেশি, প্রায় ৫০ শতাংশের সমান। একমাত্র দক্ষিণ এশিয়াতেই দেখা যায় যে নারী পুরুষের স্বাভাবিক সংখ্যা ভারসাম্য অনুপস্থিত। দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে পৃথিবীর অন্যত্র নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাতটি হচ্ছে প্রতি ১০০ জন পুরুষের ১০৬ জন নারী। আর দক্ষিণ এশিয়ায় সেই অনুপাতটি উল্টে দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০০ জন পুরুষে ৯৪ জন নারী। পন্ডিতদের হিসাবানুসারে স্বাভাবিক অবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের মোট সংখ্যা যা থাকা উচিৎ ছিল তার থেকৈ প্রায় সাড়ে সাত কোটি নারী দক্ষিণ এশিয়া থেকে উধাও হয়ে গিয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার ১১২ কোটি লোকের মধ্যে ৪০ কোটি লোক প্রতিদিন ক্ষুধার্ত থাকেন, ২৬ কোটি রোক ন্যুনতম স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। ৩৩ কোটি লোকের ভাগ্যে বিশুদ্ধ পানীয়জল জোটে না এবং ৮৩ কোটি লোক উপযুক্ত পয়:সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন। এই হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার হৃদয়বিদারক মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি। সবচেয়ে দুখ:জনক হচ্ছে এই যে ১৯৮৭ সালের পর গোটা পৃথিবীর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া হচ্ছে একমাত্র অঞ্চল যেখানে ঠান্ডা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও আবার নতুন করে "আধা গরম" যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং সামরিক ব্যয়ভার বেড়েছে। যদিও ১৯৯৭ সালের পর পৃথিবীর অন্য কোন অঞ্চলে সামরিক ব্যয় বাড়েনি, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ১৯৮৭-৯৪ কালপর্বে সমগ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামরিক ব্যয় ১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে পক্ষান্তরে উন্নত শিল্পায়িত দেশগুলোতে এ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ৪১.২ শতাংশ, অথচ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রত্যেকটি দেশেই আলাদা আলাদাভাবে এই সময় সামরিক ব্যয় কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে আঞ্চলিক ব্যয় আলাদাভাবে এই সময় সামরিক ব্যয় কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে আঞ্চলিক ব্যয় বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১২.৪ শতাংশ।

দক্ষিণ এশিয়ার ১১২ কোটি লোকের মধ্যে ৪০ কোটি লোক প্রতিদিন ক্ষুধার্ত থাকেন, ২৬ কোটি লোক ন্যূনতম স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। ৩৩ কোটি লোকের ভাগ্যে বিশুদ্ধ পানীয়জল জোটে না এবং ৮৩ কোটি লোক উপযুক্ত পয়:সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন।

সারণী ৯.৪ ঃ দক্ষিণ এশিয়ায় আয় এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত ব্যয় পরিস্থিতি

তুলনীয় সূচক	বাংলাদেশ	ভূটান	ভারত	নেপাল	পাকিস্তান	শ্রীলংকা
মাথাপিছু আয় (১৯৯৩, ডলারে)	২২০	-	৩০০	১৯০	৪৩০	৬০০
মাথাপিছু আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)						
ক. ১৯৬৫-৮০	(-)০.৩	০.৬	১.৫	-	১.৮	২.৮
খ. ১৯৮০-৯৩	২.১	-	৩.০	২.০	৩.১	২.৭
শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় (মোট জাতীয় আয়ের শতাংশ), ১৯৯২	২.৩	-	৩.৭	২.৯	২.৭	৩.৩
স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয় (মোট জাতীয় আয়ের শতাংশ), ১৯৯০	১.৪	-	১.৩	২.২	১.৮	১.৮

উৎস: UNDP: 1996

দক্ষিণ এশিয়ায় যে দুঃখজনক মানব পরিস্থিতির চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো তার মধ্যে যদি বাংলাদেশকে স্থাপন করে অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়া দেশসমূহের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে মর্মযন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পায় বই কমে না। আয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই তিনটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনামূলক বিরাজমান দৃশ্যটি ১৯৯৬ সালে অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক প্রণীত দক্ষিণ এশীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এখানে তুলে ধরা হলো। ৯.৪ নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, আয়ের প্রবৃদ্ধির মাপকাঠিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নয়। ১৯৬৫-৮০ কালপর্বে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বাংলাদেশে বৃদ্ধিতো পাইনি বরং দশমিক তিন শতাংশ হারে প্রতি বছর হ্রাস পেয়েছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ নয়-দম বছরেও বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তান আমলে অর্জিত আয়ের মাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি। এই সময়ে ভুটান, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা সকলেই ইতিবাচক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের তুলনায় দ্রুততর হারে সামনে

এগিয়ে গেছে। ১৯৮০-র পর বাংলাদেশের ইতিবাচক হারে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই হার ছিল মাত্র ২.১ শতাংশ। একমাত্র নেপাল ছাড়া সকলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে তা ছিল কম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই তুলনামূলক নিম্নহারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানব উন্নয়নে নিদারুন সরকারী অবহেলা। ১৯৯২ সালের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে সরকারী শিক্ষা ব্যয় ছিল কম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই তুলনামূলক নিম্নহারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানব উন্নয়নে নিদারুন সরকারী অবহেলা। ১৯৯২ সালের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে সরকারী শিক্ষা ব্যয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৩ শতাংশ। ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা সবগুলো দেশের তুলনাই এই হার ছিল কম। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের সরকারী স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ১.৪ শতাংশ। সেটিও তুলনামূলকভাবে নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার চেয়ে কম। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই দুখ:জনক অবস্থান ১৯৯৫-৯৬ সালেও খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স প্রণীত স্ট্রাটিক্যাল পকেট বুকে প্রদত্ত তথ্যানুসারে ১৯৯৫ সালে সরকারী শিক্ষা ব্যয় (রাজস্ব + উন্নয়ন) ছিল মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৫ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের (স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা খাতের মোট রাজস্ব ব্যয় + উন্নয়ন ব্যয়) অনুপাত আরো কমে দাঁড়ায় ১.১ শতাংশ। ২০১৭ সালে সরকারী শিক্ষাব্যয় অপরিবর্তিত থাকে এবং স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয় বেড়ে হয় ২.৬ শতাংশ। যদিও এই পরিমাপগুলো তুলনীয় দেশের স্বাপেক্ষে কমই আছে এখনো।

৯.৫ ঃ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার

দেশ	পুরুষদের সাক্ষরতার হার		নারীদের সাক্ষরতার হার	
	১৯৯৫	২০১৭	১৯৯৫	২০১৭
বাংলাদেশ	৪৯.৪	৯০.৯	২৬.১	৯৩.৫
ভুটান	৫৬.২	৯০.৪	২৮.১	৮৪.৫
ভারত	৬৫.৫	৯০.০	৩৭.৭	৮১.৮
নেপাল	৪০.৯	৮৯.৯	১৪.০	৮০.২
পাকিস্তান	৫০.০	৭৮.৮	২৪.৪	৬৫.৫
শ্রীলংকা	৯৩.৪	৯৭.৭	৮৭.২	৯৮.৬

উৎস: UNESCO: 1996, মানবউন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১৮।

এখানে সারণী ৯.৫-এ তুলে ধরা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর স্বাক্ষরতার হারের সঙ্গে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হারের একটি তুলনামূলক চিত্র। ১৯৯৫ সালের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত এই চিত্রটি থেকে দেখা যাচ্ছে একমাত্র নেপাল ছাড়া অন্য চারটি দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার হার কি পুরুষ কি নারী উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নতর অবস্থানে রয়েছে। তদুপরি রয়েছে নারীদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অধিকতর পশ্চাৎপদতা। বাংলাদেশে পুরুষদের সাক্ষরতার হার যেখানে ৪৯.৪ শতাংশ, নারীদের সাক্ষরতার হার সেখানে মাত্র ২৬ শতাংশ। ২০১৮ সালের তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাছে, বাংলাদেশের অভূত পূর্ব উন্নতি হয়েছে। প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ শুধু শ্রীলঙ্কা থেকে পিছিয়ে। লক্ষনীয় ব্যাপার হচ্ছে বর্তমানে স্বাক্ষরতার হারে পুরুষদের তুলনায় নারীরা এগিয়ে।

সারণী ৯.৬: দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাস্থ্যখাতের চালচিত্র

তুলনীয় সূচক	বাংলাদেশ	ভূটান	ভারত	নেপাল	পাকিস্তান	শ্রীলংকা
গড় আয়ু প্রত্যাশা (১৯৯৩)	৫৫.৯	৫১.০	৬০.৭	৫৩.৮	৬১.৮	৭২.০

স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ প্রাপ্ত লোক সংখ্যা ১৯৮৫-৯৫ শতাংশ	৪৫	৬৫	৮৫	.	৫৫	৯৩
অপুষ্টিতে আক্রান্ত অনুর্ধ্ব পাচ বৎসরের বয়সের শিশুর সংখ্যা ১৯৮৫-৯৫ (হাজারে)	১০৯৯৪	৯৭	৬১৭৭৫	.	৯৪০৯	৬৮৮
আন্ডারওয়েট অনুর্ধ্ব পাচ বৎসর বয়সের শিশু সংখ্যা: ১৯৯০-৯৫ (শতাংশ)	৬৬	৩৮	৫৩	.	৪০	৩৮
বিশুদ্ধ পানি পানের সুযোগপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ১৯৯০-৯৫ (শতাংশ)	৯৭	.	৮১	৪৬	৭৯	৩৩
উপযুক্ত পয়:ব্যবস্থার সুযোগপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা: ১৯৯০-৯৫ (শতাংশ)	৩৪	.	২৯	২১	৩৩	৬১

উৎস: মাহবুবুল হক, ১৯৯৭।

সর্বশেষ ৯.৬ নং সারণীতে অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য সূচকের নিরিখে এখনও সবার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। ১৯৮৫-৯৫ এই দশ বছরব্যাপী গড় হিসাবানুসারে বাংলাদেশের মাত্র ৪৫ শতাংশ লোক কোনো না কোনোভাবে স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ পেয়েছে। ইংরেজীতে যাকে বলে Access to health service (স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রাপ্তির সুযোগ) যার ন্যুনতম সংজ্ঞা হচ্ছে বাসস্থানের কাছাকাছি একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপস্থিতি, সে ন্যুনতম সংজ্ঞানুসারে বাংলাদেশে এই হার ৪৫ শতাংশ হলেও ভুটানে তা ৬৫ শতাংশ, ভারতে ৮৫ শতাংশ, পাকিস্তানে ৫৫ শতাংশ, শ্রীলংকায় ৯৩ শতাংশ এবং নেপালের হারটি জানা যায়নি। গড় আয়ু প্রত্যাশার মাপকাঠিতে ভুটান এবং নেপাল ছাড়া বাংলাদেশের গড় আয়ু প্রত্যাশা অন্যান্য সব দেশের তুলনায় কম। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে গড় আয়ু প্রত্যাশা ৫৫.৯ বছর, ভুটানে এবং নেপালে ছিল যথাক্রমে ৫১ এবং ৫৩.৮ বছর।

বাংলাদেশে শতকরা ৬৬ ভাগ অনুর্ধ্ব পাঁচ বৎসর শিশুরা ১৯৮৫-৯৫ কালপর্বে ছিল "আন্ডার ওয়েট" (UnderWeight)। এই একই সূচকের মান ভুটানে হচ্ছে মাত্র ৩৮ শতাংশ, ভারতে ৫৩ শতাংশ, পাকিস্তান ৪০ শতাংশ এবং শ্রীলংকায় ৩৮ শতাংশ। অবশ্য বিশুদ্ধ জলের এবং পয়ঃপ্রণালীর সুবিধার প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলকভাবে

পক্ষান্তরে ভারতে তা ছিল ৬০.৭ বছর, পাকিস্তানে ৬১.৮ বছর এবং শ্রীলংকায় ৭২ বছর। বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার হারও গড়ে ১৯৮৫-৯৫ কালপর্বে ছিল অন্য সব দেশের তুলনায় বেশি। বাংলাদেশে শতকরা ৬৬ ভাগ অনুর্ধ্ব পাঁচ বৎসর শিশুরা ১৯৮৫-৯৫ কালপর্বে ছিল "আন্ডার ওয়েট" (Under Weight)। এই একই সূচকের মান ভুটানে হচ্ছে মাত্র ৩৮ শতাংশ, ভারতে ৫৩ শতাংশ, পাকিস্তান ৪০ শতাংশ এবং শ্রীলংকায় ৩৮ শতাংশ। অবশ্য বিশুদ্ধ জলের এবং পয়ঃপ্রণালীর সুবিধার প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত ভাল।

দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোর মানব উন্নয়ন পরিস্থিতির এহেন উদ্বেগজনক চিত্রের মূল কারণ কি ছিল? আমরা জানি যে এর একটি প্রচলিত সহজ উত্তর হচ্ছে-এসব দেশের জনসংখ্যা বেশি এবং তুলনামূলকভাবে সম্পদ কম, ফলে প্রকৃত মাথাপিছু আয় কম, এমতাবস্থায় এ ধরনের নিম্নমাত্রার মানব উন্নয়ন এসব দেশের অনিবার্য ভবিষতব্য। এই যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য?

প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মানব উন্নয়ন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের যে তথ্যাবলী দেয়া আছে তার ভিত্তিতে শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটি ক্রমরাশিমান নির্ধারন সম্পন্ন করেছি। এই মাথাপিছু আয়ের অধিকারী হচ্ছে শ্রীলংকা এবং সেটি হচ্ছে ৩৪০৮ পি.পি.পি ডলার।

ঐ একই বছর (১৯৯৫) মাথাপিছু আয়ের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানটি ছিল পাকিস্তানের (২২০৯ পিপিডি ডলার) তৃতীয় স্থানে ছিল ভারত (১৪২২ পি.পি.পি ডলার), চতুর্থ স্থানে ছিল বাংলাদেশ (১৩৮২ পি.পি.পি ডলার) এবং ঐ বছর ষষ্ঠ বা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয়ের দেশ নেপাল (১১৪৫ পি.পি.পি ডলার)। ঐ একই বছরে (১৯৯৫) মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে দক্ষিণ এশিয়ার

ঐ একই দেশগুলোকে ক্রমরাশি অনুসারে সাজালে আমরা পুনরায় প্রায় একই ধরনের একটি ক্রমসারী দেখতে পাই। লক্ষ্যণীয় যে, মানব উন্নয়নের নিরিখে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম স্থানে আছে শ্রীলংকা (৭১৬), তারপরেই অনেক নিচে দ্বিতীয় স্থানে আছে পাকিস্তান (.৪৫৩), তার সামান্য নিচে ভারত (.৩৭১), অল্প ব্যবধানে পঞ্চম স্থানে আছে নেপাল (.৩৫১) এবং ষষ্ঠ স্থানে আছে ভুটান (.৩৪৭)। এ থেকে বহ্যত: মনে হতে পারে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় মাথাপিছু আয়ের ক্রমরাশির সঙ্গে মানব উন্নয়নমাত্রার ক্রমরাশির বেশ একটা নিখুঁত সমপাতন পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য ভুটানের এবং নেপালের ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বাদবাকি চারটি দেশ শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় যেমন ধাপে ধাপে কমেছে তেমনি ধাপে ধাপে হ্রাস পেয়েছে তাদের মানব উন্নয়ন মাত্রা। এ থকে বাহ্যত: মনে হতে পারে যে অন্তত: শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কম আয়ের সমস্যাই কম মানব উন্নয়নে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হীনতাই এখানে মানব উন্নয়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

বাহ্যত: এই যুক্তি সঠিক মনে হলেই বৃহত্তর পরিমন্ডলে আমরা যদি খোলা চোখ মেলে তাকাই তাহলে এই যুক্তি আদৌ ধোপে টেকে না। যেমন ১৯৯৭ সালের দক্ষিণ এশিয়া মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, যেখান থেকে এসব তথ্য গৃহীত হয়েছে সেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তানে ভারতের তুলনায় মাথাপিছু আয়ের নিরিখে বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুসারে ২৩ ধাপ উপরে অবস্থিত (১২৯তম পক্ষান্তরে পৃথিবীতে মাথাপিছু আয়ের নিরিখে ভারতের অবস্থান স্থান ১৪২তম)। কিন্তু মানব উন্নয়ন ক্রমরাশি অনুসারে এক ধাপ নিচে অর্থাৎ ১৩৫তম। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত এবং নেপাল এ দেশগুলোর সর্বত্রই যদি মানব উন্নয়ন ক্রমে সমপাতন লক্ষ্য করাটা মোটেও কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না। সুতরাং, শুধু দক্ষিণ এশিয়ার পরিমন্ডলে আয়রাশি ও মানব উন্নয়ন রাশির নিছক সমপাতন থেকে মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক অনুমান করা ঠিক নয়।

আসলে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে পৃথিবীতে সফল মানব উন্নয়নের যেসব জন্য আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে তাদের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়নে ব্যর্থ দেশগুলোর তুলনা করলে প্রকৃত কার্যকরণ সম্পর্কটি আরো স্পষ্ট হবে। আমরা অনায়াসে তখন দেখতে পারবো যে ভারতের মাথাপিছু আয়ের সমান হওয়া সত্ত্বেও ভিয়েতনাম ও তাজাকিস্তান উভয়ই মানব উন্নয়নে অনেক বেশি অগ্রসর। পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় আর্মেনিয়া ও গায়ানার সঙ্গে সমতুলনীয় হলেও মানব উন্নয়নে শেষোক্ত দেশগুলো অনেক বেশি অগ্রসর। একইভাবে সমধর্মী তুলনা করা যাবে বাংলাদেশের সঙ্গে কেনিয়ার এবং নেপালের সঙ্গে লেসোথার। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য নিজেদের কাছ থেকে নিজেদের (শ্রিলংকার ব্যতিক্রম ছাড়া) শেখার খুব একটা বেশি কিছু নেই। এবং সেই শিক্ষা নিতে গেলে ভূল শিক্ষাই নেয়া হবে।

কিন্তু ভারত যদি ভিয়েতনাম ও তাজাকিস্তানের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে দেখে তাহলে দেখতে পাবে যে ভারত, ভিয়েতনাম এবং তাজাকিস্তানের ১৯৯৬ সালে মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় সমান সমান অর্থাৎ যথাক্রমে ১২৪০ পিপিপি ডলার। কিন্তু ভারতে যে জায়গায় প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার হার ছিল মাত্র ৫১ শতাংশ সেখানে ভিয়েতনামে তা ছিল ৯৩ শতাংশ, তাজাকিস্তান ৯৭ শতাংশ। গড় আয়ু ভারতে যেখানে হচ্ছে ৬১ বছর, ভিয়েতনামে তা ৬৬ বছর এবং তাজাকিস্তান ৭০ বছর। মানব উন্নয়ন সূচক ভারতে যেখানে .৪৩৬, ভিয়েতনামে তা .৫৩২ এভং তাজাকিস্তানে .৬১৬। চীনের সঙ্গে ভারতের বহুল প্রচলিত তুলনাটির পুনরাবৃত্তি এখানে আর করছি না। একইভাবে ১৯৯৬ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যদি আর্মেনিয়া ও গায়ানার মাথাপিছু আয় তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে পিপিডি ডলারে সেগুলো ছিল যথাক্রমে ২১৬০, ২০৪০ এবং ২১৪০ ডলারের সমান। অর্থাৎ

আর্মেনিয়া ও গায়না পাকিস্তানের তুলনায় মাথাপিছু আয়ের নিরিখে নিচেই অবস্থিত। কিন্তু পাকিস্তানে স্বাক্ষরতার হার যেখানে ছিল মাত্র ৩৬ শতাংশ, যেখানে অন্য দুটি দেশে তা ছিল যথাক্রমে ৯৯ শতাংশ এবং ৯৮ শতাংশ। গড় আয়ু পাকিস্তানে যেখানে অন্য দুটি দেশে তা ছিল যথাক্রমে ৭৩ এবং ৬৫ বছর। মানব উন্নয়ন সূচক ছিল পাকিস্তানে ০.৪৪২ কিন্তু আর্মেনিয়ায় তা হচ্ছে ০.৬৮০ এবং গায়ানায় ০.৬৩৩। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় পিপিডি ডলারে ১৯৯৬ সালে ছিল ১২৯০ ডলার। একই বছরে লেসোথা এবং কেনিয়ার মাথাপিছু আয় ছিল তুলনীয় ৯৮০ এবং ১৪০০ ডলার। অথচ সাক্ষরতার হার বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে যেখানে হচ্ছে ৩৭ শতাংশ সেখানে লেসোথোতে তা ৭০ শতাংশ এবং কেনিয়ায় আরো বেশি ৭৬ শতাংশ। বাংলাদেশে গড় আয়ু যেখানে মাত্র ৫৬ বছর সেখানে বাংলাদেশের তুলনায় কম আয় সম্পন্ন লেসেথোতে গড় আয়ু ৬১ বছর এবং কেনিয়াতে তা ৫৬ বছর। তবে সামগ্রিক মানব উন্নয়ন সূচক নিরিখে বাংলাদেশের স্কোর ছিল .৩৬৫, কিন্তু লেসোথো এবং কেনিয়ার স্কোর হচ্ছে যথাক্রমে .৪৬৪ এবং .৪৭৩।

এসব ব্যাপকভাবে তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৯৬ সালের দক্ষিণ এশীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের রচয়িতা রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ মাহ্‌বুবুল হক স্বয়ং যে সাধারন উপসংহারে পৌঁছাছেন তা হচ্ছে:

মাহবুবুল হকের নিজের জবানীতেই তার এই নতুন অরক্ষণশীল অবস্থান গ্রহনের একটা ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উক্ত রিপোর্টের ভূমিকাতে প্রথমেই তিনি স্বীকার করে নেন যে বর্তমানে তিনি তার আগের মতাবস্থানে নেই। এই গ্রন্থের ভূমিকায় মাহবুবুল হক লিখেছেন, প্রথম জীবনে তার লেখায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে অন্ধ পূজা তিনি করেছিলেন তা থেকে তিনি এখন সরে এসেছেন। মানুষের মতের পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোনো দোষনীয় নয়, বিশেষত: যখন তা নিজের ভ্রান্তির রেখে ঢেকে না রেখে স্পষ্টভাবে স্বীকার করার মাধ্যমে কার্যকরী হয়, তখন তাতে আপত্তি না করাই শ্রেয় যদিও নীতি প্রনেতাদের বড় ভূলের জন্য অনেক সময় অন্য অনেককে বড় মাশুল গুণতে হয়। যাই হোক এরপরেও মরহুম মাহবুবুল হকের আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কৈফিয়ৎটি শিক্ষণীয় বিধায় এখানে তুলে ধরা হল:

(বহু দেশের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে শিখিয়েছে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানব উন্নয়নে পরিণত হয় না। এ জন্য সচেতন জাতীয় নীতিমালার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সাধারন মানুষের জীবনের যোগসূত্র অবশ্যই প্রয়োজন আছে। পাকিস্তানের পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্পর্কে এক দশকের অভিজ্ঞতা অজুনের পর, বেশ আগে ভাগেই আমার এই কঠিন আত্মোপলব্ধি হয়েছিল। ষাট দশকে পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয়ের বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি সৃষ্টির পর আমরা কতিপয় উৎসাহী তরুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাবিদ ১৯৬৮ সালে জাতীয় রঙ্গমঙ্গে দাঁড়িয়ে সমগ্র জাতির তরফ থেকে একটা কুর্নিশ উপহার পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, যখন দেখলাম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট জনগন তৎক্ষণাত সরকারের পতন দাবী করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যা হয়েছিল তা হচ্ছে একদিকে যখন জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অন্যদিকে তখন মানবজীবন সংকুচিত হচ্ছিল যেহেতু পাকিস্তানের চাপ প্রয়োগকারী দলগুলো প্রবৃদ্ধির সুফলসমূহ ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। [ইউএনডিপি, ১৯৯৭]

সারসংক্ষেপ

দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচক বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। মানব উন্নয়নের নিরিখে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম স্থানে আছে শ্রীলংকা (.৭৭০), তারপরেই অনেক নিচে দ্বিতীয় স্থানে আছে ভারত (.৬৪০), তার সামান্য নিচে ভুটান (.৬১২), অল্প ব্যবধানে পঞ্চম

স্থানে আছে নেপাল (.৫৭৪) এবং ষষ্ঠ স্থানে আছে পাকিস্তান (.৪০৪)। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ভারত এবং নেপাল এ দেশগুলোর সর্বত্রই যদি মানব উন্নয়নের প্রতি সমান অবহেলা থেকে থাকে তাহলেও এদের মাথাপিছু আয়ক্রমে এবং মানব উন্নয়ন ক্রমে সমপাতন লক্ষ্য করাটা মোটেও কোনো আশ্চার্যের ব্যাপার হবে না। বস্তুত: আয়ের বৃদ্ধি, আয় বৈষম্যের নিরসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সার্বজনিন প্রসার ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রমানুসারে ১৯৯৭ সনে বাংলাদেশের স্থান ছিল-
   ক. ১৫০ তম; খ. ১৪৪ তম; গ. ১০০তম।

২. ১৯৯৭ সালের প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিন এশিয়ার জনগোষ্ঠীর আয়ের পরিমাণ পৃথিবীর আয়ের ৬ শতাংশ। (সত্য/মিথ্যা)

৩. ১৯৯২ সালের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে সরকারী শিক্ষা ব্যয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৩ শতাংশ। (সত্য/মিথ্যা)-

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি?
২. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় সাক্ষরতার হারের তুলনামূলক অবস্থান কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকের মানদন্ডে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান কি সে সম্পর্কে তথ্যসহ আলোচনা করুন।
২। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে দক্ষিণ এশিয়ায় পরিস্থিতি আলোচনা করুন।

পাঠ-৯.৩ ঃ মানব উন্নয়নের পথের সন্ধানে : প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পূর্বশর্তের অনুপস্থিতি

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- মানব উন্নয়নে রাজনৈতিক পূর্বশর্তের ভূমিকা;

মানব উন্নয়নের পথের সন্ধানে ঃ প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পূর্বশর্তের অনুপস্থিতি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপ্লব অব্যবহিত সাম্যবাদী রাশিয়া ভ্রমনকালে ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সালে মস্কো থেকে প্রথম যে পত্রটি পাঠিয়েছিলেন তার প্রারম্ভেই সেখানে চলমান একটি নতুন ধরনের উন্নয়নযজ্ঞের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেন। এই মহৎ উন্নয়নযজ্ঞের সূচনাটি পরবর্তীতে কি প্রক্রিয়ায় বিপথে পরিচালিত হয়েছিল তা এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু কিভাবে তা শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র লিখিত সেই বিবরণ বাংলাদেশের সকল মানব উন্নয়ন সাধকের জন্য এক উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসাবে আজও অম্লান তাৎপর্য বহন করে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদের সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত।

রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখেছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোন দেশের মতই নয়। একবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা জাগিয়ে তুলেছে। চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদের সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পড়ে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্য্য করে: সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসস্থান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওলাদের লাঠি-ঝাটা খেয়ে মরে-জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধা সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে-উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না, কেবল মাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফেলেছে। মানুষের সভ্যতার এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিৎ। মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না, বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলেই তাবেই সত্যিকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক আমি ভালো কিছু ভেবে পাইনি-অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি ১৩৯৩ (বাং), পৃ-৯।

বস্তুত: অসাম্য রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। কিন্তু রুশ বিপ্লবের নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞ সৃজনশীল রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। রুশ দেশের উন্নয়নযজ্ঞের শুরুটা হয়েছিল একটি বৈপ্লবিক ওলট-পালটের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে "মৌলিক অসাম্য" বজায় রেখে উপর থেকে উচ্ছিষ্ট দানের মাধ্যমে যে উন্নয়ন তা শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রকৃত মানবে উন্নত করতে অক্ষম, এই বোধে অনুপ্রাণিত রুশ বিপ্লবীরা সম্পদের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে অগ্রসর হয়েছিলেন। তারা নিচুতলার মানুষদের নিছক সংবিধানে বর্ণিত অধিকার নয়, মানুষ হিসাবে বাস্তব জীবনযাত্রায় সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রদান করেছিলেন তাদের দ্বারা তাদের জন্য, তাদের উন্নয়নকে কার্যকরি করার মহতী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু এই গুরুতর দায়িত্ব পালনে যেসব উন্নত মানবিক গুনাবলী ও সক্ষমতা প্রয়োজন সেগুলো যুগ যুগ ধরে বঞ্জিত এই সাধারন জনগোষ্ঠীর তখনও আয়ত্বাধীন ছিল না। রুশ বিপ্লব তাই একটি পশ্চাৎপদ দেশের অধিকতর পশ্চাৎপদ সর্বহারা জনগোষ্ঠীকে দিয়ে উন্নত মানবসমাজ নির্মাণের প্রায় অসম্ভব একটি দায়িত্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন। অবস্থা পরিপক্ক হওয়ার

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে "মৌলিক অসাম্য" বজায় রেখে উপর থেকে উচ্ছিষ্ট দানের মাধ্যমে যে উন্নয়ন তা শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রকৃত মানবে উন্নত করতে অক্ষম, এই বোধে অনুপ্রাণিত রুশ বিপ্লবীরা সম্পদের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আগেই বিপ্লব সাধনের জটিলতা ফয়সালার জন্য লেনিনের দলকে বিপুলভাবে তাই নির্ভর করতে হয়েছিল মধ্যস্তরের ক্যাডারদের বিপ্লবী স্পৃহার উপর এবং অংশত: দলত্যাগী শিক্ষিত বুর্জোয়াদের আলোকিত কর্তৃত্বের উপর। তাদের কর্তৃত্ব ও শ্রমজীবিদের কর্তৃত্ব সর্বদা সমার্থক ছিল না। কিন্তু এ কথা রাশিয়ার চিঠিতে রবী ঠাকুরও স্বীকার করেছেন যে তাদের আন্তরিক চেষ্টা ছিল ব্যাপক আকারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসুযোগ, পুষ্টি ইত্যাদি মৌলিক সক্ষমতাবর্ধক উপদানগুলো অধ:স্তন জনগনের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে। বিপ্লবের আগুনে পুড়েই তাদের এই আন্তরিক অঙ্গীকার তৈরী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের হটিয়ে দিয়ে সম্পদের জবরদখল গ্রহনের যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল সে বিষয়ে পূর্ব সহানুভূতিশীল ছিলেন না, এর মধ্যে যে জবরদস্তি নিহিত তা একটি "প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ" হিসাবে বলশেভিকরা যেভাবে মেনে নিয়েছিলেন তার মধ্যে তিনি হয়তো বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাই বিপ্লবকে পুরোপুরি অনুমোদন না দিলেও রবীন্দ্রনাথ বিপ্লব পরবর্তী রুশ উন্নয়নযজ্ঞে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে ও আত্মমর্যাদায় নিচুতলার মানুষদের চিঠি "উপসংহার" তিনি এ বিষয়ে তার চূড়ান্ত মতটি ব্যক্ত করেছেন।

"বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়। বায়ুমন্ডলের এক অংশে তত্ত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদন্ত পেশন করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে, এও সেই রকম কান্ড। মানব সমাজে সামাঞ্জস্য ভেঙ্গে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যাষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতি প্রস্তাব উঠেছে। তীরে অগ্নিগিরি অপ্লুৎপাত বাধিয়েছে বলে সমুদ্রকেই বন্ধু বলেই এই ঘোষনা। তীরহীন, সমুদ্রের রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কুলে উঠবার বন্যে আবার আকুপাকু করতে হবে। সেই ব্যষ্টি বর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা মানুষ কখনো চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ব করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরনি পার করে দিয়ে সমাজ রক্ষা করবে কে? অসম্ভব নয়, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা, কিন্তু; চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত: ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেই দিনই রোগীর শুভ দিন।" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত পৃ: ১২২]

মানব উন্নয়নে প্রকৃত অঙ্গীকার থাকলে বৈপ্লবিক পথ বা সংস্কারমূলক পথ যিনি যে পথেরই অনুরসরক হন না কেন তাদের উভয়ের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোনো দুর্লঘ্য বাধা আজ আর নেই। শুধু প্রয়োজন মানুষের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি নি:ষর্ক অঙ্গীকার।

বাংলাদেশে বৈষম্যের মাত্রা বিষয়ে আমাদের পূর্বালোচনা এবং উপরের উদ্ধৃত্তির আলোকে আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে বাংলাদেশেও যদি প্রকৃত মানব উন্নয়নের সূচনা করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম এদেশে সার্বিক ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সেই সঙ্গে রবী ঠাকুরের অন্তদৃষ্টিকে অভিনন্দন জানিয়ে এ কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে 'বিপ্লব' একটা সাময়িক উপায় মাত্র এবং 'মানুষের সক্ষমতা ও স্বাধীনতার' ক্রমপ্রসারনের ধ্রুব পথ ধরে এগোতে এগোতে 'বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পূর্বেও কতিপয় ব্যষ্টিক সংস্কারের মাধ্যমে মানুষের সক্ষমতা ও স্বাধীনতা কিছু পরিমাণে বিকশিত হতে পারে। সুতরাং মানব উন্নয়নে প্রকৃত অঙ্গীকার থাকলে মতভিন্নতা থাকলেও যিনি যে পথেরই অনুসরক হন না কেন তাদের উভয়ের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোনো দুর্লঘ্য বাধা আজ আর নেই। শুধু প্রয়োজন মানুষের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি নিঃশর্ত অঙ্গীকার।

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে "মৌলিক অসাম্য" বজায় রেখে উপর থেকে উচ্ছিষ্ট দানের মাধ্যমে যে উন্নয়ন তা শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রকৃত মানবে উন্নত করতে অক্ষম, এই বোধে অনুপ্রাণিত রুশ

বিপ্লবীরা সম্পদের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে অগ্রসর হয়েছিলেন। মানব উন্নয়নে প্রকৃত অঙ্গীকার থাকলে মতভিন্নতা থাকলেও যিনি যে পথেরই অনুসরক হন না কেন তাদের উভয়ের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোনো দুর্লঘ্য বাধা আজ আর নেই। শুধু প্রয়োজন মানুষের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি নিঃশর্ত অঙ্গীকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. রাশিয়ায় উন্নয়নযজ্ঞের শুরুটা হয়েছিল সুশৃঙ্খলভাবে। (সত্য/মিথ্যা)-

২. রুশ বিপ্লবের জটিলতা রোধে লেনিনের দলকে মধ্যস্তরের ক্যাডারদের বিপ্লবী স্পৃহার উপর নির্ভর করতে হয়। (সত্য/মিথ্যা)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কিসের প্রয়োজন এবং কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাল-মন্দ মূল্যায়ন করে রাশিয়ার চিঠিতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশের প্রেক্ষিতে কতটুকু সঠিক বলে আপনার মনে হয়।

উত্তরমালা

ইউনিট ১

পাঠ ১.১ : ১. (গ) ২. (ঘ) ৩. (গ) ৪. (ক) ৫. (ছ) ৬. (খ)

ইউনিট ২

পাঠ ২.১ : ১. (গ) ২. (ক) ৩. (ক) ৪. (গ)
পাঠ ২.২ : ১. (গ) ২. (ক) ৩. (গ) ৪. (খ) ৫. (ক)
পাঠ ২.৩ : ১. (খ) ২. (ক) ৩. (খ) ৪. (গ)

ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১ : ১. (গ) ২. (ক) ৩. (ঘ) ৪. (গ) ৫. (গ)
পাঠ ৩.২ : ১. (ক) ২. (ক) ৩. (গ) ৪. (গ) ৫. (ঘ) ৬. (গ) ৭. (গ) ৮. (খ)
পাঠ ৩.৩ : ১. (ঘ) ২. (ঘ) ৩. (ঘ) ৪. (ক) ৫. (ক) ৬. (গ) ৭. (ঘ)
পাঠ ৩.৪ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (খ) ৪. (ঘ) ৫. (খ) ৬. (খ)
পাঠ ৩.৫ : ১. (ক) ২. (ঘ) ৩. (গ) ৪. (গ) ৫. (গ) ৬. (ক) ৭. (ক)
পাঠ ৩.৬ : ১. (ঘ) ২. (খ) ৩. (গ) ৪. (খ) ৫. (খ) ৬. (গ)

ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১ : ১. (ক) ২. (ক) ৩. (ক) ৪. (খ) ৫. (খ)
পাঠ ৪.২ : ১. (খ) ২. (ক) ৩. (ক) ৪. (গ) ৫. (গ) ৬. (খ)
পাঠ ৪.৩ : ১. (গ) ২. (গ) ৩. (ক) ৪. (খ) ৫. (ঘ) ৬. (খ)
পাঠ ৪.৪ : ১. (খ) ২. (ক) ৩. (ঘ) ৪. (গ) ৫. (ক) ৬. (ক) ৭. (গ)
পাঠ ৪.৫ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (ক) ৪. (খ) ৫. (ক)

ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১ : ১. (ক) ২. (গ) ৩. (খ) ৪. (ক) ৫. (খ)
পাঠ ৫.২ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (ক) ৪. (ক) ৫. (ক) ৬. (খ)
পাঠ ৫.৩ : ১. (ক) ২. (গ) ৩. (ক) ৪. (গ) ৫. (খ)
পাঠ ৫.৪ : ১. (খ) ২. (ঘ) ৩. (খ) ৪. (খ) ৫. (ক) ৬. (খ)
পাঠ ৫.৫ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (ক) ৪. (খ) ৫. (খ)

ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১ : ১. (গ) ২. (ক) ৩. (ক) ৪. (গ) ৫. (গ) ৬. (ক)
পাঠ ৬.২ : ১. (খ) ২. (ক) ৩. (ক) ৪. (খ) ৫. (খ)
পাঠ ৬.৩ : ১. (খ) ২. (ক) ৩. (খ) ৪. (খ) ৫. (খ)
পাঠ ৬.৪ : ১. (গ) ২. (গ) ৩. (খ) ৪. (ক) ৫. (খ)

ইউনিট ৭

পাঠ ৭.১ : ১. (গ) ২. (গ) ৩. (গ) ৪. (ক) ৫. (খ) ৬. (ক) ৭. (গ)
পাঠ ৭.২ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (গ) ৪. (ক) ৫. (ক)

পাঠ ৭.৩ : ১. (খ) ২. (গ) ৩. (খ) ৪. (ক) ৫. (খ) ৬. (ক)

ইউনিট ৮

পাঠ ৮.১ : ১. (গ) ২. (গ) ৩. (গ) ৪. (গ) ৫. (খ)
পাঠ ৮.২ : ১. (ক) ২. (ক) ৩. (ক) ৪. (খ) ৫. (খ) ৬. (খ)
পাঠ ৮.৩ : ১. (ক) ২. (খ) ৩. (গ) ৪. (খ) ৫. (খ)
পাঠ ৮.৪ : ১. (ক) ২. (খ) ৩. (গ) ৪. (গ) ৫. (ক)
পাঠ ৮.৫ : ১. (গ) ২. (গ) ৩. (ক) ৪. (খ) ৫. (খ)

ইউনিট ৯

পাঠ ৯.১ : ১. (ক) ২. (ক) ৩. (খ) ৪. (খ)
পাঠ ৯.২ : ১. (খ) ২. মিথ্যা ৩. সত্য
পাঠ ৯.৩ : ১. মিথ্যা ২. সত্য

প্রধান সহায়ক গ্রন্থসমূহ

০১. Government of Pakistan, 1970, The Separate Report of the East Pakistani Members of the panel of Advisor Economista Consituted for drafting the Fourth Five Year Plan: 1970-75.

০২. মাহবুবুল হক, ১৯৯৭, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ইউএনডিপি, লন্ডন ও নিউ-অর্ক।

০৩. বিবিএস, স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেট বুক, ২০০০

০৪. ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর খান, The Strategy of Development ib Bangladesh, 1989, McMillan, লন্ডন।

০৫. মহিউদ্দিন আলমগীর ও বারলেজ, ১৯৭৪, Bangladesh National Income and Expenditure: 1949/50-1969/70, বি আইডিএস, ঢাকা।

০৬. ড. মাহাবুব হোসেন ও কাজী শাহাবুদ্দিন, Agricultural Development in Bangladesh: Challenges and Issues, ইবি-বাংলাদেশ ডায়ালগ, ঢাকা

০৭. Ministry of Irrigation and Flood Control, 1986, National Water Plan Project-Final Report, Dhaka.

০৮. সালিমুল হক, আতিক রহমান এবং গর্ডন আর কনওয়ে, Environment Aspects of Agricultural Development in Bangladesh, 1990, ইউপিএল, ঢাকা।

০৯. ১৯৮০/৮৪'র কৃষি শুমারি এবং ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারির প্রাথমিক প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ।

১০. বিশ্বব্যাংক, ১৯৯৪, World Population Prjection (1994-95), ওয়াশিংটন, ইউএসএ।

১১. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ৫ম খসড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ঢাকা।

১২. আবু আব্দুল্লাহ, ১৯৭৬, "Land Reform and Agrarian Change", বি.আই.ডি.এস, বিডিএস ভল্যুম ৪, নম্বর ১, ঢাকা, ১৯৭৬।

১৩. ড. দেবপ্রিয় ভট্টচার্য ও ড. জায়েদ বখ্‌ত, ১৯৯১, "Investment, Employment and value added in Bangladesh Manufacturing Sector in 1980s:Evidence and Estimate" in BIDS, BDS Vol 19 No, 1 & 2, 1991 Dhaka

১৪. সি এ এফ দৌলাহ, ১৯৯৭, Privatization Experience in Bangladesh: 1991-1996, A Study of the World Bank, Dhaka.

১৫. সাদরেল রেজা ও মো: আলী রশীদ, ১৯৯৭, Foreign Investment in Bangladesh, ঢাকা.

১৬. ড. সুলতান হাফিজ রহমান, Two decades of Trade and Investment in bangladesh, ঢাকা

১৭. অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও আহমেদ আহসান, ১৯৮৩, Disinvestment and Denationalisation: Profile and Performances, BIDS, Dhaka.

১৮. অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও আখতার মাহমুদ, ১৯৮৬, The Ecnomic Performance of Denationalised Industries in Bangladesh: The Case of Jute and Textile Industries, BIDS, Dhaka.

১৯. বাংলাদেশ ব্যাংক, Annual Report, 1991, ঢাকা.

২০. সিপিডি, A Review of Bangladesh Developmet: Changes and Challenges, 2000, Dhaka.

২১. মোস্তাফিজুর রহমান, ১৯৯৭, " External Sector Performance in FY 1997: An Update". in সি,পি,ডি. ১৯৯৭, ঢাকা।

২২. বিবিএস (১৯৯৭), Statiscal Pocket Book, ঢাকা.

২৩. অধ্যাপক রেহমান সোবহান (সম্পাদিত), From Aid Dependence to self Reliance: Development Options for Bangladesh, ইউপিএল, ঢাকা.

২৪. বাজেট : ২০০০-২০০১।

২৫. সিপিডি ১৯৯৭, A Review of Bangladesh Developmet: Crisis in Governmance, Dhaka.

২৬. ইমেড (EMED) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন রিপোর্টসমূহ।

২৭. অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস, বিভিন্ন বছরের বাজেটের সংক্ষিপ্ত সার।

২৮. ড. ওমর হায়দার চৌধুরী, "A Review of the Fiscal Sector," in BIDS, Bangladesh Economy 2000. Selected Issues, 2000, Dhaka.

২৯. আইএমএফ, বিভিন্ন বার্ষিক রিপোর্ট।

৩০. বিনায়ক সেন, "Politics of Povesty Alleviation". in সি.পি.ডি ১৯৯৭, প্রাগুক্ত।

৩১. অমর্ত্য সেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি।
আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০।

৩২. "United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1998, Newyork-Oxford, Oxford University Press, 1998.

৩৩. "UNDP, Bangladesh Human Development Report
Monitoring Human Development, Appril, 1998, Dhaka.

৩৪. "UNDP, Human Development Report 1996 Newyork
Oxford, Oxford University Press, 1998.

৩৫. "UNESCO, Division of Statistics, ESCAP, Socio- Economic profile of SAARC Coumtries, 1996.

৩৬. Mahbub ul Hoq-Human Development in South Asia, 1997. Karachi, Oxford University Press Newyork-Delhi, 1997.

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, ভদ্র, ১৩৯৩।